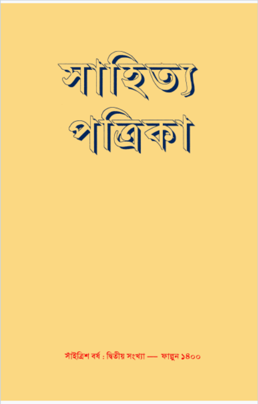

Vol. 37 | No. 2 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা, সংস্কৃত ও ইন্দো-ইউরোপীয় সম্প্রসারিত ঐতিহাসিক পুনর্গঠনতত্ত্বের ব্যবহার প্রসঙ্গ

Volume	37
Issue	2
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনিরুজ্জামান
Published online	February 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i2.2
Pages	29-69
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ২

Check for updates

বাংলা, সংস্কৃত ও ইন্দো-ইউরোপীয়

সম্প্রসারিত ঐতিহাসিক পুনর্গঠনতত্ত্বের ব্যবহার প্রসঙ্গ

মনিরুজ্জামান

প্রতিপাদ্যসার:

পুনর্গঠন পদ্ধতি বা Comparative Reconstruction (সংক্ষেপে CR Method) তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের নবতম সংযোজন। ইয়ুং গ্রামারিয়ানদের ধ্বনিপরিবর্তন সূত্র, বিশেষত গ্রাসম্যানের অনুসন্ধানের পথ ধরে এর বিকাশ। পুনর্গঠনের মূল কথা : 'recovery of earlier stages which is not attested.' এই পদ্ধতিটি জটিল নয়, কিন্তু বহু ধারায় ও পথে প্রবেশ্য।

আধুনিক ভারতীয় প্রায় সব ভাষারই জন্মসূচনায় সংস্কৃতের প্রভাব ছিল অবধারিত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় প্রত্ন শব্দগুলির ধ্বনি পুনর্গঠনে প্রধান সূত্রগুলির ইঙ্গিত সংস্কৃতে লভ্য। তবে সংস্কৃত ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে প্রচলিত অনেক ধারণাই অস্পষ্ট।

পূর্বতন ভাষারূপ বা প্রত্ন পর্যায়ের রূপ পুনর্গঠন সূত্রটি বাস্তবভিত্তিক না হলেও ভাষা ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রে তা আমাদের প্রচলিত জ্ঞানের বাইরে নিয়ে যায়। বাংলা ভাষার পূর্বতন অর্থাৎ প্রত্ন ও মহাপ্রত্ন-ভাষারূপগুলির সন্ধানে এই তত্ত্বের প্রয়োগ খুবই জরুরি। বাংলা ভাষার ইতিহাস সন্ধানের প্রচলিত সূত্রগুলিরও পুনর্মূল্যায়ন হওয়া আবশ্যক।

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

০. প্রস্তাবনা

ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পুনর্গঠনতত্ত্ব ও পদ্ধতির বিকাশ সাম্প্রতিক ঘটনামাত্র। উনিশ ও বিংশশতাব্দীর গুরত্বপূর্ণ দশকগুলিতে পাঠ (Text) ভিত্তিক ভাষাবিজ্ঞান ছিল কালানুক্রমিক ভাষার ইতিহাস, ভাষা-বংশ নির্ণয় এবং শ্রেণীভাগের সমস্যাগুলিতে সীমাবদ্ধ। এর ফলে তৌলনপদ্ধতি ও ভাষা পরিবর্তনের প্রসঙ্গগুলি নির্দিষ্ট উপাত্ত, অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষিত সূত্রের বাইরে লক্ষ্য করা যায় নি। ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে তারকা চিহ্নিত শব্দ ব্যবহৃত (পুনর্গঠিত) হতো এবং বহির্ভাষা-সংযোগ বা প্রভাব সংঘটিত তথ্যাভাবকে পরিপূরকতা দানের কোনও প্রক্রিয়া জ্ঞাত ছিল না। সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক আবশ্যিক প্রসঙ্গগুলোও ছিল অবহেলিত। সিদ্ধান্ত ছিল অনুমাননির্ভর প্রপঞ্চ।

তুলনামূলক পদ্ধতি (আধুনিক) প্রাচীন পদ্ধতির সার্থক, সফল এবং নতুনতর প্রতিবদল বা প্রতিস্থাপন। এই পদ্ধতির প্রতি পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রথম সুফল হয় এই যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের (একমাত্র বংশ পীঠিকা) একক গরিমা ধুলিস্যাৎ হয়ে পড়ে এবং এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষার বংশ পীঠিকা নির্মাণ সম্ভব নয় বলে যে ধারণা ছিল তা অমূলক প্রমাণ করে আফ্রিকার সোহেলি ভাষা বংশ, উত্তর আমেরিকার ও জাপানের ভাষা বংশগুলি পুনর্গঠন করা হয়। রোমান ভাষা-গুলিরও প্রত্নভাষারূপ বিনির্মাণ করে লাতিনের সাথে তুলনায় প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয় এবং ইন্দোইউরোপীয় ভাষাবংশের ক্ষেত্রেও অনেক অস্পষ্টতা দূর করে, অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাসের পরিমার্জন ঘটিয়ে প্রত্ন-ইন্দোইউরোপীয় ভাষার আলোচনাকেও সম্ভব করে তোলা হয়।

এই অভিযাত্রার গোড়ায় ছিল ভিন্ন লক্ষ্য। পাণিনির অনেক সূত্র এবং ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর উল্লিখিত কিছু সমাধান না পাওয়া সমস্যার সহজ ব্যাখ্যা লাভ খুব জরুরি হয়ে ওঠে। ভাষাতত্ত্বের প্রাচীন পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে নব দৃষ্টিপাতের সূচনা ঘটে এভাবে। সস্যুরের অনুমানের ভিত্তিতে নবআবিষ্কৃত আনাতোলীয় প্রভৃতি ভাষার পূর্বরূপ পুনর্গঠনকালে সূত্র ও পদ্ধতি ব্যবহারের পরিবর্তন সেই আবশ্যকতাকে সূচিত ও তীব্রতর করে।

ভাষাতত্ত্বের অগ্রগতি আজ তার নানা শাখায়। পুনর্গঠন পদ্ধতির প্রয়োগও এখন বহু সম্প্রসারিত ও বহুমাত্রিকভাবে সমৃদ্ধ। বিশেষত আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন-তত্ত্বের সাবেক ধারণায় যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তাকে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে জ্ঞানের বহুতর বিকাশের একটি প্রমাণ বলে গ্রহণ করা চলে। এই বিষয়ে সাধারণভাবে কিছু আলোকপাত করাই বর্তমান প্রবন্ধের একটি উদ্দেশ্য।

আলোচানার সুবিধার্থে পুনর্গঠনতত্ত্বের এই সব ধারণার কিছু প্রাথমিক প্রসঙ্গ ও প্রাচীন ভাষা-সন্ধানে এই তত্ত্ব প্রয়োগের সামান্য বিবরণ ও ফলাফলের কথা উল্লেখ করে আমরা বাংলা ভাষার প্রসঙ্গে আসবো। আধুনিক বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রবাহে সৃষ্ট যে সব সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত রাখা হয়েছে, বলাবাহুল্য বাংলা ভাষার মৌলভিত্তি অনুসন্ধানে যথার্থ সূত্র পুনর্গঠন ও অন্তর্গত সেই সব সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিকল্প নেই, বিধায়, সম্প্রসারিত পুনর্গঠনতত্ত্বের প্রয়োগ-সম্ভাবনা পরীক্ষাই হবে আমাদের লক্ষ্য। তবে এখানে পুনর্গঠন প্রক্রিয়াগুলির ব্যবহার ও ব্যাখ্যা অপেক্ষা ভাষা-পরিস্থিতি ও ইতিহাসকেই গুরুত্ব দিতে হয়েছে। তাই বাংলা ভাষা এই প্রবন্ধের একতম লক্ষ্য নয়, পুনর্গঠনতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গই এখানে প্রাথমিক বিবেচনা ও বিস্তারিত আলোচনার বিষয়। বাংলাভাষা নিয়ে পরবর্তী গবেষকগণ এই দৃষ্টিতে আরও নতুন ও গুরুতর আলোকপাতের লক্ষ্যে এগিয়ে আসবেন, এখানে শুধু এই প্রত্যাশাটুকু রেখে যাই।

১. পুনর্গঠন পদ্ধতি

পুনর্গঠনতত্ত্বে তুলনামূলক পদ্ধতির দায় ও দায়িত্ব বহু। যাই হোক, সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমজ শব্দের-রূপের-বা গৃহীত গঠনের প্রতিটি ধ্বনি-এককের নিয়মিত পরিবর্তন ও অনিয়মিত ধর্মের কারণ ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যা সূত্রে সমজ শব্দের প্রত্নরূপ প্রতিস্থাপন, ভাষার পূর্বরূপ পুনর্গঠন, শাখায়ন, উত্তর-রূপ (Knot) নির্ণয়, বিভিন্ন গিঁটের অবস্থানিক দূরত্ব ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধগত ক্রম (RC তত্ত্ব) নির্ধারণ, সম্পর্কনির্দেশ বা বর্ণন ও বিচার প্রভৃতি পুনর্গঠন পদ্ধতির কয়েকটি সনাতন দিক (বৈশিষ্ট্য)। অধুনা এই সব ধারণার ক্ষেত্রেও নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। যেমন 'শাখায়ন' (splitting) প্রসঙ্গে বলা যায়-'মুদ্রণ' শিল্পের বিকাশ কালে বিশেষতঃ খ্রী. ১৫শ শতকে জর্মন ভাষায় 'মহাস্বরধ্বনি সরণ' (great vowel shift) ঘটে — এতে ধ্বনির উচ্চারণ ও প্রকৃত শব্দে পার্থক্য দেখা দিতে থাকে, যথা দ্বৈত ধ্বনিরূপে, go, name, ride, এবং ধ্বনি বাদ বা অনুচ্চার্য রেখে know, debt, stone, প্রভৃতির উচ্চারণ। এই প্রক্রিয়ায় (অর্থাৎ একক ধ্বনির দ্বৈতস্বরায়ন এবং আদ্য k-, মধ্য-b- ও অন্ত্য -e ধ্বনির উচ্চারণ শূন্যতা বা নৈঃশব্দতা) মূলভাষা থেকে ক্রমে দূরত্বব্যঞ্জক 'অভিশ্রুতি'র গঠন লক্ষ্যযোগ্য হয় পূর্বে আগত বা প্রবেশীধ্বনির সন্ধিক্রমে। ফলত ধ্বনির এই বিবর্তনরূপ নিয়ে জর্মন শাখায় ইংরেজি ভাষার বিবর্তন ও বিভাজন ঘটে যায়। তেমনি, 'উপভাষার শ্রেণীকরণ' সম্পর্কেও বলা হচ্ছে যে এটি একটি বিশেষ সমস্যা। কোনও প্রত্ন বা মূল ভাষা থেকে একাধিক উপভাষা বেরিয়ে এলে তারা শুধু পূর্ব বা মৌলরূপগুলি সংরক্ষণই করে না, নবায়নও করে। নিকট ও দূরের উপভাষাগুলির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আনয়নে রক্ষণশীলতার

হার তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই মূল ধ্বনি পুনর্গঠনে সদৃশতা একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। কেননা 'সংরক্ষণ ' (shared retention) অপেক্ষা নবায়ন (shared innovation) অনেক জটিল ও ভিন্ন এবং বৈদেশী বৈশিষ্ট্যমুখী । যেমন ইন্দোইউরোপীয় ভাষা হয়েও সংস্কৃত ভাষার ট-বর্গীয় বা মূর্ধন্য ধ্বনির আধিক্য ঘটেছে যা মূল ভাষায় অনুপস্থিত, অজ্ঞাত ও অসম্ভব। অথচ সংস্কৃত ভাষার প্রধানতম বৈশিষ্ট্যেরই অঙ্গ এই ধ্বনি ; ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সংস্কৃত মূর্ধন্য ধ্বনিগুলির প্রত্নরূপ পুনর্গঠনে তাই পণ্ডিতগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে (পরে উদ্ধৃতি ও মন্তব্য দেখুন)। সেখানে 'ভাষা-অঞ্চল' তত্ত্ব দিয়ে সমাধানের কথা ভেবেছেন কেউ কেউ, আবার অনেকে এক্ষেত্রে 'সমান্তরাল উদ্ভব' [PD] তত্ত্বকেও টেনে আনতে উৎসুক। আসলে পুনর্গঠনতত্ত্বের সম্প্রসার ও সমাধানকল্পে যোগ্যতা বৃদ্ধি ঘটছে এভাবেই। ঋণায়ন (borrowing foreign features) ও অনুবাদ তত্ত্বের অনেক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তথা অভিজ্ঞতাও এখন পুনর্গঠনতত্ত্বকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে। সুতরাং বলা চলে নবতর সমস্যাই তার নতুন দিগন্তকে সম্ভাবনাময় ও সমৃদ্ধ করে তুলছে।

উপরোক্ত ধারণাগুলির বাইরে তুলনামূলক পুনর্গঠনতত্ত্ব এখন ভাষা শ্রেণীকরণের (typology) নানা সমস্যাকেও প্রাধান্য দিচ্ছে। অবশ্য সেটা এর মৌল স্বভাবের দিক থেকে খুবই সঙ্গত। সমবায়ী, অসমবায়ী প্রভৃতি ধরনে ভাষার সনাতন রূপ বিচারই নয়, যথার্থ শ্রেণী বা স্বরূপ পরিচয়গত ভাগে বিশ্লেষণ করার মধ্যেও এর সম্প্রসারিত তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটছে। মোট কথা, ঐতিহাসিক-তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব সেই উনিশ শতকী পাঠ-ভিত্তিক 'ফিললজি' (comparative philology) কিংবা ভাষা বংশগত শ্রেণীকরণবিদ্যা আর নেই; এখন তদপেক্ষা অনেক ভিন্ন হয়ে পড়েছে। তুলনামূলক পুনর্গঠন পদ্ধতির বিকাশ এর কারণ।

পূর্বতন বা প্রত্ন ভাষারূপ পুনর্গঠন পদ্ধতিটি সর্বদা পাঠভিত্তিক নয়। এই অর্থে তা বস্তুভিত্তিক নয় এবং কল্পনা এবং অভিজ্ঞতা এরও মূল ভিত্তি। কিন্তু তথাপি এর আন্তর্শৃঙ্খলা এত নির্ভরযোগ্য যে ভাষা ও সংস্কৃতির উভয় ক্ষেত্রে তা আমাদের প্রচলিত জ্ঞানের বাইরে নিয়ে যায়।

বলেছি পুনর্গঠনতত্ত্বটি ঐতিহাসিক ক্রম-সম্পর্কিত তত্ত্ব । প্রাচীন স্তরের রূপ নির্মাণ ও বর্ণনাই এর কাজ। সেখানে এ ধারণা তাই অমূলক নয় যে এর কাজ সীমিত অর্থাৎ এর অন্য ব্যবহার অনহেতু। প্রকৃতপক্ষে ভাষা পরিবর্তনের মধ্যেই ভাষার জন্ম ; তাই ভাষার প্রকৃতি, বর্তমান ও পূর্বরূপের সম্পর্ক, তার মধ্যে সঙ্গতি এমন কি সঙ্গতিচ্যুতি বুঝাবার ক্ষেত্রে অন্যতম সহায় পুনর্গঠনতত্ত্ব। যা ইতিহাসের সাক্ষ্য ও প্রমাণ সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠিত এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃসূত্রযোগে সমান্তরাল

সত্যে উন্নত ও সুস্পষ্ট করে। সম্পর্কিত ঘটনা ও ধারার ক্রম নির্ণয় (RC-তত্ত্ব) এখানে মূল বিষয়। পুনর্গঠন ও বৃক্ষচিত্রতত্ত্বে তাই RC (অর্থাৎ Relative Chronology) -এর জ্ঞান অপরিহার্য।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের নবতম সংযোজন পুনর্গঠন পদ্ধতি বা Comparative Reconstruction, সংক্ষেপে CR Method। পুনর্গঠনের মূল কথা 'recovery of earlier stages which is not attested'। ইয়ুং গ্রামারিয়ানদের ধ্বনিপরিবর্তন সূত্র, বিশেষতঃ গ্রাসম্যানের অনুসন্ধান পথ ধরে এর বিকাশ। পদ্ধতিটি এক হিসাবে অজটিল কিন্তু বহু ধারায় ও পথে প্রবেশ্য। এর একটি ধ্রুব উদাহরণ নিম্নরূপ। -প্রাচীন ভাষাগুলিতে ক্রিয়াপদের বিশেষগঠনে দ্বিত্ব ঘটতো। যেমন সংস্কৃতে 'দেওয়া' থেকে পুরাঘটিত রূপ পাওয়া যেত 'দা-দাও' ইত্যাদি। কিন্তু মহাপ্রাণিত ধ্বনিযুক্ত শব্দে এর ব্যতিক্রম হতো। যথা,

		সংস্কৃত	লাতিন	গ্রীক
দ্বিত্বতা	ঃ	দা-দাও	de-di	de-dō-ka ......(১)
মহাপ্রাণতা	ঃ	ব-ভূঅ	--	Pe-pū̲t-ka ....(২)

(১) এর উদাহরণে 'দিল' ক্রিয়ারূপের গঠন পাওয়া যায়, (২) এর উদাহরণে 'হল' ক্রিয়ারূপের। কিন্তু শেষের ক্ষেত্রে দ্বিত্বতার পরিবর্তে ধ্বনি পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে। এই মহাপ্রাণতা কেন, এই ধ্বনিরূপ কি আগম, না প্রাচীনের সংরক্ষণ (অবশিষ্টায়ন) ? এক্ষেত্রে প্রাচীন আদ্য ব্যঞ্জনরূপটি কি ছিল প্রমাণ ব্যতিরেকে তা জানা সম্ভব ছিল না। পরে দেখা গেল পূর্বরূপে মহাপ্রাণ ধরা গেলে কয়েকটি সুবিধা হয় এবং তা গ্রাসম্যানের সূত্রকেও প্রতিষ্ঠিত করে। নতুবা তা প্রত্ন-ঈরানীয় ভাষার মত অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ ধ্বনির নিরপেক্ষতা তত্ত্ব এবং তার জটিল ব্যাখ্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। অতএব সহজভাবেই আমরা বলতে পারি আলোচ্য রূপগুলির প্রত্নরূপ ছিল * bha-bhu-va * phet-phū-ka. অর্থাৎ এটাই গ্রহণযোগ্য পুনর্গঠিত রূপ। এটি গ্রহণযোগ্য হলে মূলভাষার শব্দরূপে CeC- গঠনের ছকে {-এস}, {স্তা-}, {ধে-} প্রভৃতি রূপমূলগুলিতে সস্যুর স্বভাবতই সন্দেহ প্রকাশ করবেন; এবং কুরিলোভিজ পরে এসে লুপ্ত Laryngeal ধ্বনিটিসহ [হ্এস] , [স্তহ্], [ধেহ্], [আগ>হেস] প্রভৃতি রূপ পুনর্গঠন করবেন সেটাই প্রত্যাশিত (এ ব্যাপারে পরে ৫ নং অনুচ্ছেদের আলোচনা দেখুন)। পুনর্গঠন তত্ত্ব এভাবেই প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত হয়।

পুনর্গঠন পদ্ধতি আবার দুই প্রকার। 'অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনে' (Internal Reconstruction) অপর ভাষার তথ্য বা প্রমাণ ব্যতিরেকে ইতিহাস-লুপ্ত এক প্রত্ন-স্তরের গঠনরূপ পুনরাবিষ্কার করা হয়। সেক্ষেত্রে এইরূপ পুনর্গঠন একটি সম্ভাব্য গঠন মাত্র, যদিও বৈজ্ঞানিক সূত্র দ্বারাই তা পরীক্ষিত। এর মধ্যে যে ধারণাটি কাজ করে তা হলো যে, ইতিহাসের যাত্রা প্রবাহে বা পরিবর্তমান ধারায় ঘাটে ঘাটে এমন সব চিহ্ন থেকে যায় যার থেকে প্রমাণলুপ্ত পূর্ববর্তী ধারার ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব। অতএব আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (IR) হল ভাষার পূর্বরূপ ও বিবর্তিত রূপ, বিবর্তন প্রক্রিয়া ও পূর্বরূপের (বিগত) সাথে উত্তররূপের ক্রমবিবর্তনের সূত্র ভিত্তিক আপেক্ষিক ক্রম *(Relative chronology)* ইত্যাদি জানার সূক্ষ্ম প্রণালীবদ্ধ একটি প্রক্রিয়া।

দুই বা ততোধিক ভাষার বিবর্তনকালের ঘাট *(knot)* গুলির পারস্পরিক সম্পর্কের সম্ভাব্য সূত্রদৃষ্টে একে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এর প্রাথমিক ভিত্তি সমজ শব্দরাশি। শব্দের শরীরে থাকে কালের ছাপ। এ ছাড়াও অবস্থানগত পরিচয় জানা যায় শব্দ-ধর্মে।

বস্তুতঃ শব্দই ভাষার উৎস প্রমাণ করে বা উৎস-মূলের সন্ধান দেয়। কেননা এর গঠনই প্রমাণ করে এর অন্তর্গত ধ্বনি ও ব্যাকরণী রূপের কাল-মাত্রা আর তাই দিয়ে বোঝা যায় এর প্রাচীনতা (archaic use বা *proto relation)* বনাম আধুনিকতা (modernism, standardism, non-traditionalism or universalism) এবং সংরক্ষণতা (retention. relication) বনাম সংবৃদ্ধিমানতা (innovation, diffusion)। শব্দ অবশ্যই তার পরিবেশের ও প্রসঙ্গের চিহ্ন এবং গঠন ও অর্থতাৎপর্য বা ব্যবহারগত মান নির্দেশক। শব্দের এই বহুমাত্রিকতার কারণে সমজ শব্দের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের লক্ষ্যবস্তু হয় সেই সম্ভাব্য সূত্র যা *RC* -সূচক। ভাষার বিভিন্ন ঐতিকালিক বিভাজনী গিঁট (knot) এই সম্পর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাতে সম্পর্কের আরোহনী বা উচ্চাবচক্রম (hierarchy) ও তার দিক (directoin) নির্দেশিত হয়। এই ভাবে * ক > খ >(গ > ত)/ ঘ ভাষা- ক্ষেত্রে প্রত্নভাষা* ক- এর উত্তর ভাষারূপ (Reflex) সমূহের (যথা ,ত এবং ঘ) দিকগত সম্পর্ক ও আন্তঃঅবস্থানিক সম্পর্ক বোঝা যায়. কিংবা ঘ/ত (<* গ) < খ < ক রূপের পুনর্গঠন ও পুনর্গঠনকালে গিঁট (শাখায়ন) নির্দেশন করা সম্ভব। এর দ্বারা RC প্রতিষ্ঠিত হয়। পদ্মশ্রী দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়ক প্রতিষ্ঠিত ভাষা-সম্বন্ধগত ক্রমটি এখানে উদাহরণত উল্লেখ করা যেতে পারে :

$* \ OABH \rightarrow H \ / \ [(OAB) \rightarrow O \ / \ (AB)] \rightarrow$

H (indi)..... 1
O (rya)......2
B (engali)....3
A (ssamese) 4

(এখানে তীর চিহ্ন 'বিবর্তনের দিক', তীর্যক চিহ্ন 'উত্তররূপের গতি', তৃতীয় বন্ধনী 'গোষ্ঠীসাযুয্যের নৈকট্যাধিক্যতা', প্রথম বন্ধনী 'বিবর্তন-পূর্ব সমতা' এবং সংখ্যা '*RC* সূত্র ক্রম'-এর দ্যোতক। (দ্রষ্টব্য. 'Controlled Reconstruction of Oriya, Assamese, Bengali and Hindi' অভিসন্দর্ভ ১৯৬১, প্রকাশ ১৯৬৬।)

পট্টনায়ক এই তত্ত্বে চারটি ভাষার বিবর্তনক্রম ও আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। মাত্র একটি ভাষার প্রত্নরূপ পুনর্গঠনকালেও *RC*- তত্ত্ব কে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন বালগোবিন্দ মিশ্র (১৯৬৭)। তিনি হিন্দী ভাষার ইতহাস পুনর্গঠন করতে গিয়ে প্রত্নকালীন বিভিন্ন গিঁটগুলো (knot) কোন ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আধুনিক রূপগুলি যে তারই সরাসরি বা পরোক্ষ উত্তররূপ তা এই তত্ত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁর বিবর্তন সম্পর্ক জটিল হলেও একরৈখিক, যথা, * *IE -II - IA - MIA* ইত্যাদি। *RC* কেবল পদ্ধতিই নয়, পদ্ধতির অন্তঃসার; কেবল একটা ঘটনাই নয় ঘটনার অন্তর্সত্য। একে বলা যায় সিঁড়ি কিংবা আরও স্পস্ট করে বলা চলে সংযোগ-সেতু। আরোহন ও অবরোহনের সহায় । বর্তমান আলোচনার এলাকা সীমিত বিধায়, পরিবর্তনের রূপ ব্যাখ্যার জন্য যে কালগত ব্যবধান সীমায় তথ্যের temporal ও spatial সম্পর্ক সূত্রের সমীকরণ ঘটে, এখানে তার বিচার বা বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, আমাদের উদ্দেশ্যও তা নয়।[১] বাংলা ভাষার ধারা বিশ্লেষণে সম্পর্কিত ধারাক্রম স্থাপনায় ও পরিবর্তনের মূল স্রোত থেকে তার বাঁক ফেরা ও দিক পরিবর্তনের সূত্র আবিষ্কারে এই তত্ত্ব যে নতুন নির্দেশনা দিতে পারে, এটুকু উল্লেখ করাই এখানে আমার উদ্দেশ্য।

২. ভাষার গঠনরূপ ও শ্রেণীকরণতত্ত্ব

ভাষারূপের ভিত্তিতেই প্রত্নভাষারূপের অনুসন্ধান ঘটে। সেই অর্থে ভাষার রূপ বিচার অর্থাৎ গঠনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীকরণতত্ত্ব (typology) অনুযায়ী তার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ভাষার শ্রেণীকরণ বহুভাবেই সম্ভব (আগেও সামান্য আভাস লক্ষ্য করেছি), কিন্তু ভাষার পক্ষে দল পরিবর্তনও মোটেই অসম্ভব নয় (পরে আলোচিত)। আমরা প্রথমে শ্রেণীপরিচয় বা গঠনরূপের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করতে

চাই। রৌপ বিচারের পাশাপশি সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রসঙ্গও খানিকটা সংযুক্ত করতে পরলে আলোচনাটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হতো। কিন্তু এখানে আমাদের লক্ষ্যকে সেদিক থেকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

রূপগত শ্রেণী বিচার (typological classification) ভাষার ইতিহাস সন্ধানে কতগুলি রৌপ বৈশিস্ট্য নির্দিষ্ট করতে সাহয্য করে। কিন্তু এই ধারায় বেশীকাজ দেখা যায় না।[২] রাশিয়াতে ভাষার বৈশিষ্ট্য বিচার-ভিত্তিতে ভাষার পরিচয় গ্রহনের একটি ধারা গড়ে উঠেছিলঐ ভৌগোলিক অবস্থান ভিত্তিতে ভাষার শ্রেণীকরণে কিংবা বংশধারাক্রমে ভাষার শ্রেণীনির্ণয় অপেক্ষা আলোচ্য পদ্ধতিটা পৃথক,-যদিও এর সর্বজনীনতা নিয়ে প্রশ্নের মীমাংসা করা যায় নি এখনও।

বেনভেনিসতে এটুকু দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে ঐতিহাসিকভাবে বিচার্য বিষয়গুলি তথা বংশপরিচয়গত ভাগগুলিও রৌপ শ্রেণীভাগের বিষয় হতে পারে। ('a genetic classification is also typological')। এইভাবে রূপগত বিশ্লেষণ ভিত্তিতে শ্লেগেলকৃত ত্রিবিধ বিচারণা বা শ্রেণীকরণকে ফিংক্ পরে আবার আট প্রকারে আলোচনা করে এর মাত্রা বাড়াবার চেষ্টা করেন, যথা :

ক.	বিশ্লেষী [বিসংযোগী]	১ আ-মূল,	[= চীন]
		২ প্রত্যয়-মূল	[= পলিনেশিয় ভাষা]
খ.	প্রত্রয়ান্বয়ী	৩ ধাতুপ্রধান	[= আরবি]
		৪ প্রত্যয়-মূল	[= গ্রীক]
		৫ প্রত্যয়ান্ত্য	[= জর্জিয়]
গ.	সংশ্লেষী [সংযোগী]	৬ সংসক্ত / অ-স্বাধীন	[= তুর্কি]
		৭ বহু সংশ্লেষাত্মক	[= এস্কিমো]
		৮ অধিক্রমী/অননুক্রমী	[= বান্টু-সুবিয়]

[F.N. Finckএর প্রস্তবিত শ্রেণীকরণ (১৯০৯)]

শ্লেইগেল যাকে বলেছিলেন Isolating (অসমবায়ী), Agglutinating (যৌগিক) ও Inflecting (সমন্বয়ী), তাকে এখানে Isolating (ক), Flexional (খ) ও Affixal (গ) এই তিন ভাগে ও আট প্রকারে (১-৮) বিভক্ত করা হয়েছে। এই বিভাজীকরণের ভিত্তি যাই হোক, আমেরিকার অসংখ্য ভাষা ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের আরও কিছু ভাষার প্রকৃতি তাতে আদৌ ধরা পড়ে নি। ফলে, পরে, ভাষাশ্রেণীকরণের আরও কয়েকটি আদর্শ (মডেল) নিয়ে পরীক্ষা

নিরীক্ষা হয়। যথা- জাতিভিত্তিতে ভাষাভাগ (ককেসীয়-মোঙ্গলীয় -আমেরিকান-ইথিওপীয়), ভৌগলিক সম্পর্ক ভিত্তিতে ভাষা ভাগ (আর্নস্ট লেওই বা Lewy কৃত আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় আঠারো রকম শ্রেণীভাগ), বাক্য ভিত্তিক ভাষাভাগ (Scherer প্রস্তাবিত চার প্রকার বাক্য গঠন ভিত্তিতে ভাষা বিভাজন) ইত্যাদি। এই সব নানা প্রয়াসান্তে সাপির (Edward Sapir) যে পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন[৩]- প্রথমে তিনভাগে, পরে সংশোধিত আকারে চার ভাগে,-তাতে পৃথিবীর ভাষাগুলি সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য ও বিস্তারিত জ্ঞানের খানিকটা ধরা পড়েছে বলে মনে করা হয়। এই বিভাজনে প্রথমত ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে মৌলিক, সাধিত, প্রামাণ্য ও অবিমিশ্র-এই চারপ্রকার ধারণায় গেঁথে তিনি ভাষায় শব্দ-যোগ , প্রত্যয়-যোগ, শব্দ ও প্রত্যয়-যোগ প্রভৃতি শ্রেণী চরিত্র সন্ধান করেছেন। এরপর দেখেছেন তার অন্তর্গত প্রক্রিয়া (যেমন, বিশ্লিষ্ট না সংযুক্ত ইত্যাদি)। তৃতীয় পর্যায়ে ভাষাকে ভেবেছেন সমন্বয়ী-অসমন্বয়ী-বহুসমন্বয়ী গঠনের বিষয়রূপে। এতে তিনি প্রাচীন ধারণার পুনঃব্যাখ্যা না করে নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাচীন ব্যাখ্যাগুলির পুনর্মূল্যায়ন করে তাতে নবব্যাখ্যা ও নব শ্রেণীকরণ প্রক্রিয়া যোগ করেছেন। তাঁর চতুর্থ ধরণটি এই নতুন ব্যাখ্যায় একটি প্রগত সংযোজন। তদ্বারা তিনি দেখাতে চেয়েছেন কেন ভাষা নতুন কালে নতুন ব্যাখ্যা দাবী করে এবং একই সাথে একাধিক উপভাগের বা উপশ্রেণীর অধীন হয়। তাঁর এই ব্যাখ্যাই বেনভেনিস্‌তে, য়াকবসন প্রভৃতিকে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্যারিস ও ওস্‌লো সম্মেলনে আরও গভীরতর ভাবনার দিকে নিয়ে যায়। তাঁদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ('The system and not the inventory, must serve as a basis for typology') সাংগঠনিক ভাষাতাত্ত্বিকগণের কাছে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ভাষাপরিবর্তন, আন্তঃভাষা সম্পর্কায়ন ও সংযোগায়ন, ভাষাবৈপরীত্য ও সংশ্লেষায়ণ প্রভৃতি যেমন ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের বিষয় বা বিচার এলাকা, তেমনি ভাষা পুনর্গঠনেরও। রূপগত [রৌপ] ধারা বিশ্লেষণে যে সূত্র অনুসৃত হয়, পুনর্গঠনতত্ত্বে তার প্রসারিত প্রয়োগ সম্ভব। ফেয়ারব্যাংকস, সাউথওয়ার্থ, পট্টনায়ক, এবং হোয়েনিগসওয়াল্ড প্রভৃতির কাজের ভিত্তিতে এর তত্ত্বের গুরুত্ব উপলব্ধ হলেও এর প্রসার তেমন ঘটে নি এখনও, যদিও পুনর্গঠনের প্রসঙ্গ বহু ক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। বাংলাভাষার এবং উপভাষার পুনর্গঠনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ[৪], পট্টনায়ক ও বর্তমান লেখকের ভিন্ন ভিন্ন কাজে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এর প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। (৬ নং উপচ্ছেদ ভাগের আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

প্রসঙ্গত যোগ করা যায়, তাত্ত্বিক আলোচনা একটা বিশেষ অবস্থাকেই ব্যাখ্যা করে মাত্র, অবস্থান্তরে তার প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না। তখন বিকল্পতত্ত্বের সৃষ্টি হয়।

ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বে ঐতিহাসিক সূত্র নিয়ে তাত্ত্বিক বিচার হয়, প্রতিতত্ত্বও গড়ে ওঠে। রৌপবিচারে (রূপগত) ইতিহাস (বংশগত)ও ভৌগোলিক অবস্থান নিরপেক্ষতায় এই তাত্ত্বিক বিচার রাশিয়ায় জনপ্রিয়তা পাবার পরপরই তা বিশ্বে ছড়ায় এবং তুলনামূলক বিচারের ওপর এর প্রভাব বৃদ্ধিপায়।

পুনর্গঠন তত্ত্বের নানা আলোচনায় বিশেষত ধারাবহিকতা বা বিকাশ ধারা নির্ণয়ক রৌপ শ্রেণীকরণে (typology) বিশেষজ্ঞগণ এখন আরও কিছু নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আরোপের কথা ভাবছেন। মস্কোর গণমৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে (People's Friendship University) জি.পি. মেলনিকভ দর্শনের তত্ত্ব ভিত্তিতে ও হামবোল্ডৎ প্রভৃতির চিন্তাশ্রয়ে ভাষার তন্ত্র (system) ও তন্ত্রনির্দেশকের একটি রৌপ শ্রেণীকরণ আদর্শ (model) উপস্থাপন করেছেন। এখানেও শুধু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে ধারাবাহিকতা ভাষার সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য, তবে তা নানা ভাষায় নানারূপে ঘটে এবং তার মধ্যে একটি সাধারণ রূপ আবিষ্কার করা যায়। এই আবিস্কার দ্বারা বোঝা যায় ধারাবাহিকতায় এ ক্ষেত্রে কোন ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত বা নবায়নকৃত ও অর্জিত হয়েছে। উদাহরণত দ্রাবিড় ভাষার উল্লেখ করা যায়। এখানে উরালো-আলতাই (Uralo-Altic) ভাষার প্রত্নকালীন বৈশিষ্ট্যধারণ ও সংরক্ষণ প্রত্যাশিত বলে তুর্কী ভাষার (অনু/ উপ) সর্গ যোগাত্মক গঠন তাতে দেখা যায়। আবার গঠন সমতা সত্ত্বেও সেমীয় ভাষার মত যৌগিক রূপ সমতা এখানে দুস্প্রাপ্য তবে বিরল নয়। '৭০ দশকে ন্যাস্ট্রাস্টিক তত্ত্বে সে কথাই প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ যৌগিক ভাষার নিয়মে অনুসর্গাদি যোগটাই বড় নয়। তারও বড় হল যোগ প্রক্রিয়া ও তার দৈর্ঘ্য (lenght of chain of affixes)। দ্রাবিড় ভাষার অতীত ইতিহাসমূলে তার লেখ্যরূপের মধ্যে ধাতুশব্দের উত্তর-প্রত্যায়িত অবস্থান হতো দীর্ঘ। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতীয় ভাষার প্রতিবেশে, বিশেষত তেলেগু ভাষায়, 'স্বরসাম্যতা' ও অন্যান্য রূপধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন প্রণালী গড়ে উঠলে ভাষার মৌলিক ধর্মের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তখন প্রত্ন ভাষার যৌগিক ধর্মে যোগ হয় নব্য সমন্বয়ী প্রথায় ভাষার সংগঠন প্রক্রিয়া। ভাষায় ব্যঞ্জনের প্রভাব হ্রাস ও স্বরধ্বনির ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে এরকম হয়। এর প্রমাণ এই ভাষার আন্তঃধ্বনি পরিবর্তনের ভেতরেই লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ যেমন , তেলেগু ভাষায় শব্দের মধ্য বা মধ্যাবস্থানীয়- স-,মধ্য-দ- এর ব্যঞ্জন ধর্মের গুণ হ্রাস ঘটে যাওয়ায় একধরনের -র- ধ্বনি সৃষ্টি হয়; মালেশিয়া-পলিনেশিয়া ভাষায় স্পৃষ্ট-দন্ত্যধ্বনির ঘোষতা ও পরে উষ্মীভবনতার দিকে বিবর্তনও এমনি একটি সাধারণ ধ্বনি পরিবর্তন।

বাস্তবত ব্যঞ্জনধ্বনির বল হ্রাস প্রক্রিয়া ঘটলে ভাষায় মহাপ্রাণতার উচ্চারণ ক্ষেত্রে ব্যঞ্জন+মহাপ্রাণতা স্থলে ব্যঞ্জনপূর্ব অবস্থায়ই উচ্চারণ জোর হারায় ও ফলে ব্যঞ্জনের পূর্ব স্পৃষ্টতাগুণ স্পৃষ্টতাহীন গুণে রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হয়।

বাংলাদেশেও এর উদাহরণ খুব সাধারণ ও স্পষ্ট। বিশেষতঃ পূর্বপ্রান্তিক উপভাষাগুলিতে ফ. স্থলে প, (এবং কখনও প), ধ স্থলে দ', ভ স্থলে ব' প্রভৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক। (দ্রষ্টব্য,মনিরুজ্জামান ১৯৯১)

বলা হয়ে থাকে যে স্বর ধ্বনিগুণ ও অনুরণনশীলতা বৃদ্ধির দ্বারা ('arising through vowelisation and sonorisation of sound system') ধ্বনি গঠনের মূল ধারার ক্ষেত্রে ব্যঞ্চনধ্বনির উচ্চারণে শিথিলতার নিয়ম (weakening of articulation of consonant) অনুপ্রবেশ করে এবং ফলে ব্যঞ্জনধর্ম অপেক্ষা স্বরীয় নিয়মে (vocalism at the cost of consonantism) জোর পড়ে বা তার ভূমিকাই সবল হয়। মহাপ্রাণতার গঠন ব্যঞ্জনের উচ্চারণ প্রকৃতি বা অবস্থানের হেরফেরের কারণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে এবং এর নানা রূপের প্রতিফলন দেখা দেয়।

৩. ভাষা পরিবর্তন

আমরা ধ্বনি বা রূপধ্বনি পরিবর্তনের প্রসঙ্গে এসে গেলেও এখানে আরও স্পষ্টভাবে বুঝাতে চেষ্টা করব যে ভাষার গঠনরূপের সমস্যায় কিংবা বিকারে ভাষার ধারাবহিকতা বা বিপরীতক্রম-সম্পর্ক নির্ণয় প্রয়াস কতখানি জরুরি। শ্রেণী নির্ণয় সমস্যা এর এক পর্যায়। তাতে একটা তন্ত্রকেই প্রাধান্য দিয়ে এবং পুনঃশ্রেণীকরণের মধ্যে খাপ খাইয়ে নিয়ে নব্য ধারণা উপস্থিত করা চলে। কিন্তু শেষ পর্যায়ে তার স্বাতন্ত্র্য পূর্বরূপের সাথে সম্পর্ক দিয়েই গঠিত হতে হয়। ভাষা পরিবর্তনের সমস্যাও তাই। পরিবর্তনের রূপগুলির ভিত্তিতে তার অখণ্ড পূর্বরূপের পুনর্গঠন কখনই এক রৈখিক হয় না,--- ভাষা পরিবর্তন এক বিচিত্র ও বিস্ময়কর প্রাকৃতিক নির্বাচন।

তুলনামূলক পুনর্গঠন (CR) মূলত পরিবর্তনেরই পুনঃএকত্রীকরণের বা অখণ্ডিকরণের প্রক্রিয়া। সুতরাং পরিবর্তনের ধারা বিষয়েও তার জ্ঞান এখানে আবশ্যক। বোঝার সুবিধার্থে এখানে ভাষার বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তনের কয়েকটি বিশেষ ধারাকে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি সনাতন রীতিতে রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তন ও ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনে সীমিত না রেখে অভ্যন্তরী-প্রকৃতি পরিবর্তনের প্রসঙ্গ পর্যন্ত উল্লেখ করা গেল। কারণ এটা খুবই সহজ কথা যে পরিবর্তন শুধু ভাষার গঠনেই

(অর্থাৎ রূপ ও ধ্বনি পর্যায়ে) হয় না, এর বড় ধাক্কাটি আসে আরও একটি দিক থেকে, যাকে বলছি "স্বরূপ পরিবর্তন"।

পূর্বতন ভাষারূপ বা প্রত্ন পর্যায়ের রূপ পুনর্গঠন সূত্রটি বাস্তবভিত্তিক না হলেও ভাষা ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রে তা আমাদের প্রচলিত জ্ঞানের বাইরে নিয়ে যায়। বর্তমান উপ-অধ্যায়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করবো যে বাংলা ভাষার পূর্বতন মহা প্রত্নভাষাগুলির সন্ধানে এই তত্ত্বের প্রয়োগ এদিক থেকে খুবই জরুরি ছিল। এই সুবাদে বাংলাভাষার ইতিহাস সন্ধানের প্রচলিত সূত্রগুলির পুনর্মূল্যায়ন হওয়াও আবাশ্যক।

(৩. ক) **রূপ পরিবর্তন :**

কোনও কোনও ভাষা আছে তারা মূলত ছিল সংশ্লেষিভাষা। পরে এদের মধ্যে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ঘটে থাকলেও সর্বত্র তা' একরকম নয়. সে সব ক্ষেত্রে এ ভাষা অনেকটাই বা প্রায় সম্পূর্ণতই বিবৃতধর্মী। এই উপমহাদেশের অনেক ভাষাই এখন এরকম। কোনও কোনও ভাষা আছে যারা গঠনগতভাবে ক্রিয়ান্ত্য। যেমন, বাংলা। কিন্তু একই রকম ভাষা (ক্রিয়ান্ত্য) অনেক অঞ্চলে কর্মান্ত্য হয়; যেমন ইংরেজি। এই ইংরেজি ভাষা মূলত জর্মন গোষ্ঠীর ভাষা। আর জর্মন ভাষার আদি বৈশিষ্ট্য ছিল ক্রিয়ান্ত্য, এখন কর্মান্ত্য। তবে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করছেন জর্মন আবারও আগের রূপে প্রত্যাবর্তনের প্রবণতা দেখাচ্ছে। ঠিক এই রকম দেখা যায় চীনা ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। চীনা ভাষা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এই যে এই ভাষা অসমবায়ী (isolating)। এই ভাষার শব্দগুলি অভংগ ও সাধারণতঃ একাক্ষরিক। এর বাক্যে শব্দের অবস্থান ধ্বনিনিরপেক্ষ ও রূপনিরপেক্ষ, এমন কি ব্যাকরণ নিরপেক্ষ। এই ধারণার ভিত্তি কি বলা মুশকিল। চীনা ভাষা --সুরেল ভাষা । এবং এর অসমবায়ী প্রকৃতি সম্পর্কে যে ধারণার কথা বলা হলো সেটা আসলে তার অতিপ্রাচীনরূপ অর্থাৎ ধ্রুব পরিস্থিতির কথা। আধুনিক চীনা ভাষা বৈচিত্র্যধর্মী (মেন্ডারিন, সাংহাই, কেন্দ্রীয়, প্রভৃতি একাধিক ভাষারূপ ছাড়াও) এবং অক্ষর সংখ্যা নিরপেক্ষতায় শব্দ ও রূপতাত্ত্বিকগঠনের অনুকূল।

(৩.খ) **ধ্বনি পরিবর্তন :**

এইরূপ পরিবর্তন দল পরিবর্তনে রূপ নেয়, তার উদাহরণ দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠির তেলেগু ভাষা। তুর্কীয় ভাষা বংশের মতো দ্রাবিড় ভাষাও মূলত যৌগপ্রধান। তেলেগু ভাষার পুনর্গঠিতরূপে যৌগিক বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত। কিন্তু আধুনিক তেলেগুতে স্বরধ্বনির প্রয়োগাধিক্য (বা চাপের ভার) এবং ব্যঞ্জনের প্রয়োগহ্রাস কোনও কোনও ব্যঞ্জনকে অব্যবহার্য করছে-- এর ফলে শব্দে স্বরের নানা বিবর্তন শুরু হয়েছে এবং

মূল্ ব্যঞ্জনগুলি পরস্পর দূরত্ব হারিয়ে সংলগ্ন হয়ে উঠছে। বাংলা 'অলাবু', 'অকুমারী' প্রভৃতি শব্দেও যেমন.এখন আদ্য-'অ' এর ব্যবহার নেই। এটা হয়েছিল এজন্যে যে . একস্থানের ঝোঁকি অন্যস্থানে গিয়ে পড়তে শুরু করেছিল। তেলেগুতেও আদ্য স্বরধ্বনিগুলির ব্যবহার হ্রাস হয়ে উঠেছে- কিন্তু তার কারণটা বাংলার মত নয়। তেলেগুতে লুকিয়ে থাকা (গুপ্ত) অর্থে 'দাগু' শব্দের ব্যবহার আছে। কিন্তু এখানে দ এসেছে ড থেকে এবং ইতিহাস-পূর্ব প্রত্নকালে এই ড ছিল মূর্ধন্য-ভব তালব্য ধ্বনি। সব মিলিয়ে শব্দটা ছিল প্রায় এই রকম=*'অঝণ্ক'। তার থেকে আদ্য ধ্বনি লোপ এবং অন্ত্য ধ্বনি যোগ হয়ে 'দাগু' হয়েছে। স্বরধ্বনিটার ব্যবহার ভিন্নতা গোটা শব্দটার প্রকৃতিতেই আঘাত পড়েছে, এবং ব্যঞ্জন ধ্বনিটি ক্রমাগত পরিবর্তনের স্রোত-শিকার হয়েছে।

স্বরধ্বনির পরিবর্তনে কেবল যে সনাতন 'গ্রেট ভাওয়েল শিফ্ট্' এর কথাই জানি, তাই নয়। এই জাতীয় উদাহরণ থেকে ভাষা-প্রকৃতি বদলের ইতিহাসে আরও দুটি বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ মিলছে, যথাঃ

(ক) ১. সাধারণ ব্যঞ্জন ধ্বনি অনুরণিত ধ্বনিতে রূপ নিচ্ছে :

যথা , কম্পন র $<$ দ, স	(যথা তেলেগু)
তরল ল $<$ দ, ড	(উচ্চ দ্রাবিড়)
উষ্ম দ^{o} $<$ (ত $\rightarrow$ দ)	(স্পেন, মালেশি-পোলেনেশি)

২. ভাষা-বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে :

অপিনিহিতি $>$ অভিশ্রুতি	(জর্মনের মহা স্বরপরিবর্তনে ইংরেজি ভাষার সৃষ্টি)

(খ) ৩. আদিম রূপ ক্ষয়িত হচ্ছে :

যৌগিক $>$ প্রত্যয়ান্ত্য	(তেলেগু)
সংশ্লেষি $>$ বিবৃত	(বাংলা [এবং অধিক প্রত্যয়ান্ত্য ভাষাসমূহ])

(৩. গ) **স্বরূপ পরিবর্তন ও ভাষায় নতুন আদর্শারোপ :**

ভাষা যেমন ব্যাকরণে ও ধ্বনিতে পরিবর্তন আনে তেমনি তার স্বরূপে এবং পরিচয়েও ভিন্ন হয়। এর ফল সর্বচুড়ান্তে গেলে হয় 'ভাষাহরণ' বা 'ভাষা নিঃশেষণ'। অন্যথা গোষ্ঠীধর্ম পরিবর্তন।

[ক] সাধারণ পরিবর্তনের মধ্যে দেখি রূপগত ধর্ম পরিবর্তন বা টাইপোলজিকাল চেঞ্জ। দ্রাবিড় ভাষায় এই পরিবর্তন আশু লক্ষিত হচ্ছে। গবেষকগণের ধারণা এই ভাষা 'সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে'। -- এখন কানাড়া

এমনকি তামিল ভাষীরাও তা মানতে পারছে না। তাদের ধারণা এই ভাষা উরালো-আলতাই ভাষাবংশের সাথে সম্পৃক্ত। আর এজন্য তুর্কী জাতীয় ভাষাগুলির সাথে রৌপ গঠনে মিল পাওয়া যায় এদের। কিন্তু তেলেগু ভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অত্যধিক (শতকরা ৮০%) এবং আধুনিক তেলেগু ভাষায় আধুনিক অনেক ভারতীয় ভাষার মত স্বরসাম্য নীতি অনুসৃত হচ্ছে। এজন্য বলা হচ্ছে যে, আধুনিক তেলেগু তুর্কীয় ভাষার ঢং (গঠনরূপ) ছেড়ে রুশীয় ভাষার প্রত্যয়ান্ত্য গঠনরূপে পরিবর্তিত হচ্ছে।

[খ] ভাষায় কারকের ব্যবহার হয় দুই পদ্ধতিতে। গ্রীকদের ক্ষেত্রে হতো বিশেষ্য আশ্রয়ে, অর্থাৎ বাক্যের উদ্দেশ্য বা কর্তাংশপদ ও বিধেয়াংশ পদসমূহের নানা সম্পর্কঘটিত ধারণার কেন্দ্র যে বিশেষ্যপদ তার গঠনগত ভূমিকা দেখে। ভারতীয় ক্ষেত্রে হতো ক্রিয়াংশের আশ্রয়ে। সস্যুর প্রথম 'বাক্য' নিয়েই সংশয় তুললেন এই বলে যে ভাষা-তন্ত্রের সাথে বাক্যের গঠনের সম্পর্ক নেই। হেইয়েলম্‌শ্লেভ বিষয়টিকে আরও বিশদ করার পর ১৯ শতকের পরে কারকের এই গ্রীক-ভারত কেন্দ্রিকতাকে অনেকেই মুছে দিতে চাইলেন একটা সর্বজনীন চরিত্র সন্ধানের চেষ্টায়। ফলে দেখা গেল পদক্রমতত্ত্ব আর শূন্য-রূপসহ কারকী চিহ্নের রূপতাত্ত্বিক প্রকরণে পার্থক্য ভাষা বিশেষে প্রায় ইতরবিশেষহীন।

এই জ্ঞানের প্রয়োগ থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে সব ভাষায় কারকের একই রকম মাত্রা হয় না, সে ক্ষেত্রে ১ : ১ সম্পর্ক খুঁজে না পেলেও এর সর্বজনীনতা বিষয়ে খুঁতখুঁতে হওয়ারও আবশ্যকতা বিশেষ নেই। এখানে ভাষার 'পারঙ্গমতা' (দক্ষতা) তত্ত্বের ওপর 'মূল্যাধিক্যতা' (Hjelmslev: 'valeur exprimee') তত্ত্বের গুরুত্ব দিয়ে বলা হল, যে কোনও 'ভাষিকরূপ' আসলে তার মূল্যেরই অভিব্যক্তস্বরূপ। ('a linguistic form is an expressed value') ভাষা উপাদানের চাপের বা ভারের লঘু-বৃদ্ধির ওপর থেকে দৃষ্টি এই 'expressed value' বা অভিব্যক্ত মূল্যাধিক্যতার দিকে সরছে। এর প্রমাণ মিলছে কিছু ভাষা বিবর্তনে এবং চিত্রটা এইরূপ :

ক. কারক-সম্বন্ধ ⟹ খ. পদান্বয়ী অব্যয় (মূল্যরূপান্তর) ⟹ গ. ধারণার দার্শনিক যুক্তি ও তার স্থানকাল

[গঠনরূপ] [অর্থরূপ]

[তন্ত্র : { (১) ক. দূরান্বয় – নৈকটান্বয়
খ. স্বাধীন – অধীন [সামঞ্জস্যতা]
(২) কর্তৃতা- বিধেয়তা]

[গ] আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি তুর্কী ভাষার রূপ (যৌগিক) আর রুশী ভাষার রূপ (প্রত্যয়ান্ত্য) এক নয়। এর কারণ দুই ভাষা এক বংশের বা এক বংশের নয় বলে, তা নয়। কারণ, যে কোনও বংশের ভাষাবৈশিষ্ট্য অন্যত্র সংশ্লেষিত, আরোপিত বা ঋণকৃতভাবে স্থানান্তরিত হতে পারে। এই জন্য চীনা ও জাপানি ভাষা পৃথক, তবু চীনের লিপি থেকে শুরু করে সংখ্যাশব্দ, উচ্চভাব-প্রকাশক শব্দ ও কিছু কিছু ব্যাকরণী প্রসঙ্গ জাপানি ভাষায় কখন যে স্থায়ীভাবে ঢুকে আছে তা একেবারে অজ্ঞাত না হলেও এ বিষয়ে ওরা সর্বসচেতন ছিল না। জাতীয়বাদী চিন্তায় ভাষাশুদ্ধি আন্দোলন করে এর কতটুকুই বা পরিবর্তন করা যাবে। তুর্কীদের এ-বিষয়ে সচেতনতা অধিক। আদিকাল থেকে এ পর্যন্ত তাদের ভাষায় (কোনানভ-তত্ত্ব অনুযায়ী) তাদের আদিম তন্ত্রকে (system Uralo-Altaic) তুর্কী ভাষীরা অপরিবর্তিত ও অপ্রভাবিত রেখেছে। যেমন তাদের প্রাচীন ধ্বনিরূপ, রূপতাত্ত্বিক ও রূপগত বিন্যাস মোটামুটি তুর্কী ভাষার প্রাচীন রূপরেই উত্তররূপ। ভাষা সংরক্ষণের এটা একটা চমৎকার আদর্শ।

কিন্তু ভাষা সংরক্ষণ করতে গিয়েই সনাতন বোধ ও নব্য (আধুনিক) বোধে প্রায়শ মিল ঘটে না। তখন ভাষা সংরক্ষণের ভিতর দিয়েই পরিবর্তিত, এমনকি ভাষাভাষীর স্বরূপ জিজ্ঞাসায়ও অনেকখানি ফাঁক সৃষ্টি হয়। উপজাতি বা অবজাতিদের ভাষায় ওরকম খুব ঘটে। আমাদের দেশে চাকমাদের মধ্যে সনাতন গ্রীয়ার্সনী ধারণার সাথে আধুনিক ও তরুণদের উজ্জীবনমূলক ধারণার কিছু ছেদ দেখা যাচ্ছে। তারা মনখেমর লিপিতে প্রত্যাবর্তন ও চাকমার স্বতন্ত্র উদ্ভব ইতিহাস পুনর্গঠনে উৎসাহিত হচ্ছে।

পুনর্গঠনে (তত্ত্ব) ভাষার কালিক ও স্তরিক বিকাশ ঐতিহাসিকদের বর্ণনার মত করে দেখানো হয় না। এখানে ভাষান্তরসমূহের উপাদান পুনর্গঠন করে তুলনা দ্বারা স্তরগত সম্পর্ক এবং পূর্বরূপ ও উত্তর-রূপগুলি ভাষিক (ও সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক, সম্ভব হলে) প্রবণতাগুলির প্রভাব ও সূত্রগুলি নির্দেশ করা হয়। এ ছাড়া থাকে এরিয়াল-টপোগ্রাফিকাল-জিওগ্রাফিকাল সত্যের প্রতিবিম্বন। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক উপাদান-সংযোগকালে ভাষারূপের বিভিন্নতার পরিমাপ। নৃতত্ত্বের বিশেষ সমস্যা দাবী করলে এখানে তাও বিচার্য। এক কথায় এখানে ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক-তুলনামূলক/বৈপরীত্যনির্দেশমূলক ও সমাজভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার সংমিশ্রণ ঘটে। ব্যাপক মাঠকর্ম ও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দ্বারাই তা সম্ভব। এদেশে এখনও তা অপেক্ষিত। তবে সনাতন অবস্থার রূপান্তর চাইলে যে তা নানামুখী হয় এবং তখন সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার মৌলিকতা নষ্ট হয়, মধ্যপ্রদেশের (ভারত) ভীলদের চার-পাঁচ

রকম ভাষারূপ আজ তাই প্রমাণ করছে। কারণ এরা নিজেদের কখনও বলছে গোণ্ডি, কখনও মারাঠি, কখনও হিন্দী-মিশ্র ইত্যাদি।।

৪. সংস্কৃত ভাষা, পুনর্দৃষ্টি

আধুনিক ভরতীয় প্রায় সব ভাষারই জন্মসূচনায় সংস্কৃতের প্রভাব ছিল অবধারিত। তেলেগু ভাষায়ও যা, পূর্বদেশীয় প্রধান ভাষাগুলিতেও তাই। এই ভাষাগুলির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর সংস্কৃতের প্রলেপন আচ্ছাদন পড়ে যায় চিরকালের জন্য। এই প্রক্রিয়ায় উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলির আর্য নাম ও বৈশিষ্ট্য ধারণে অযৌক্তিকতা দেখা যায় নি, কিন্তু দক্ষিণের ভাষাগুলির আত্মপরিচয় সংকট বেশ জটিল আকার নেয়। এখনও তার সমাধান মেলে নি। সংস্কৃত দেবভাষা হয়েও স্থলন মুক্ত ছিল না। পন্তিতগণ 'ঋণায়ন' এর নাম দিয়ে দ্রাবিড় ভাষা থেকে সংস্কৃতের মধ্যে কিছু ধ্বনি (যথা ট-বর্গীয় ধ্বনিসমূহ), কিছু শব্দ (যথা উলু, ভিটা, খাল, মোট বা মুটে, মুড়ি প্রভৃতি) এবং কিছু ব্যাকরণী রীতির (যথা সমাপিকা ক্রিয়া পদের বিকল্পে নামপদীয় শব্দ রূপের ব্যবহার ; ক্রিয়ান্ত্য বাক্য গঠন প্রভৃতি) কথা উল্লেখ করেন, আবশ্য সুকুমার সেন এবং শহীদুল্লাহ্ দ্রাবিড় প্রভাব বিষয়ে কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাব প্রকাশ পোষণ করেছেন। তবে আধুনিক পন্ডিতগণ ঋনায়ন (Borrowing) স্থলে ভাষাসংস্পর্শতা (language contact & convergence) এবং কেউ কেউ এক ভাষাঅঞ্চল (Linguistic Area)-গত ধারণার বিকাশ ঘটিয়ে ফাঁকগুলি পূরণ করে নিতে চান। কিন্তু তত্ত্বে আছে প্রতিতত্ত্ব। আজ এ সমস্যা নতুন করে দেখা তাই জরুরি হয়ে পড়েছে, কারণ বোঝা যাচ্ছে যে ইউরোপীয় বা বহির্ভারতীয় আর্য ভাষা এবং ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই বৈষম্য তথা আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। হয়ত এ বিচারের ওপর বাংলা ভাষার গবেষণার ভবিষ্যৎও কিছুটা মুক্তি লাভ করতে পারে।

সংস্কৃতের ওপর ভারতীয় ভাষার প্রভাব-তত্ত্বটি যেমন পুনর্বিবেচনাযোগ্য, তেমনি লক্ষ্য করা দরকার সে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় বহির্ভারতীয় (প্রাচীন) ভাষার বৈশিষ্ট্যও বিদ্যামান ছিল কিনা। যে মূর্ধন্য-তত্ত্বের জন্য দ্রাবিড় ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষাকে পরবর্তী ভাষা-বিকাশ রূপে ধরা হয়, সে সম্পর্কে পণ্ডিতবর্গের ধারণা এক নয়। ১৮৮৩ সালে Fortunatov প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে মূর্ধন্য ধ্বনিগুলো ইন্দো-ইউরোপীয় ধ্বনি বা তার উত্তর রূপ। সুকুমার সেন স্পষ্টই বলেন যে "আর্যেরা আসিবার আগে এদেশে দ্রাবিড়েরা আসিয়াছিল, এ নেহাৎ অনুমান মাত্র" অর্থাৎ আর্য ভাষা দ্রাবিড় ভাষার সংস্পর্শে এসে মূর্ধন্য ধ্বনি লাভ করে নি। বরং ভারতবর্ষে আসার

আগেই ষ-ধ্বনিটির উদ্ভব ঘটেছিল এই আর্য ভাষাতে। পারশী ভাষায় ট-ধ্বনি ও ধ্বনির প্রতিরূপটিও (ট অক্ষর বা বর্ণ রূপ)এর আর একটি ইঙ্গিত।.এরিক হুম্প ৮টি সুত্র উল্লেখ করে সম্প্রতি প্রসঙ্গটি পুনরালোচনা করেন ও ফরচুনাতভ-সূত্র পরিমার্জন করেন। অতএব অনুমান করা যায় ইন্দো-ইরানীয় ভাষাতেই এসব ধ্বনির বীজ ছিল। এগুলি প্রত্নভাষা স্তরেরই নবায়ন এবং স্বতোদ্ভাবন। সংস্কৃত মূর্ধন্যধ্বনিসমূহ তারই উত্তর রূপ (Reflex) অথবা ইরানীয় শাখার উপঋণ।।

ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা থেকে সংস্কৃতের স্বাতন্ত্র্য তথা দূরত্বসূচক বৈশিষ্ট্য এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলির দিকে এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক।

সংস্কৃত কোন ভাষা? আর্যদের প্রতিষ্ঠাকালের পর শিক্ষিত ও লোক সাধারণের ভাষা রূপটির ভদ্র ও পানিণি- অনুশাসিত রূপই আমাদের পরিচিত 'সংস্কৃত'। 'খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম- চতুর্থ শতাব্দ হইতে প্রায় পানিণি অবধি রচিত অপর সংস্কৃত কোনটিই ঠিক কথ্য অর্থাৎ মুখের ভাষা ছিল না।'

পানিণি কে? তক্ষশিলার নিকট শালাতুরে এঁর জন্ম (স্থানিক পরিচয়ের বিস্তারিত বিবরণ Beal রচিত Travels oof Hiuentsang-এ দ্রষ্টব্য); কুমার অবস্থাতেই যিনি যশঃস্বী। তক্ষশিলা বর্তমানে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। অর্থাৎ সীমান্তবাসী ছিলেন তিনি, যদিও পাটলিপুত্রে তাঁর গমনাগমন ছিল। পানিণির নিজস্ব ভাষা 'উদীচী', এটাই তখন শিষ্ট ভাষা। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত এই সীমান্ত ভাষাটাই ছিল বরেণ্য ভাষা। অপর ভাষরূপটিকে বলা হয়েছে 'প্রাচাম্'। আর এই সীমান্তটি বহিরাগত একিমিনিডদের সংস্পর্শতাবিহীন ছিল না। ব্যাকরণে পানিণি-শাসন অমান্যতা রোধ করা হতো কঠোরভাবে।

(পানিণির কাল নিয়ে ওয়েবর, ম্যাক্সমূলর, গোল্ডস্টুকার, বেলভালকার, ভাণ্ডারকার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের বিভিন্ন মত দেখা যায়; এখানে তার উল্লেখ থেকে আমরা বিরত থাকলাম।)

পানিণির ব্যাকরণ ঃ পানিণি প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার অর্থাৎ শুধু মাত্র বৈদিক ও বর্ষ-উপবর্ষ-আপিশলি-শাকল্য প্রভৃতি বর্ণিত বৈদিক-সংস্কৃতের ছাঁদটিকে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত বৈচিত্র্যগুলিকে স্বীকৃতি দেন। সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন, 'অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ পানিণির ব্যাকরণের ধার ধারে নাই। তাহারা অপানিণীয় সাধু ভাষায় পুরাণকথা কবিতা ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি পড়িত শুনিত। .... ভারতীয় আর্য যখন মধ্যস্তরে পৌছিয়াছে তখনো কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অ-সংস্কৃত লৌকিক প্রাচীন ভরতীয় আর্য ভাষার ব্যবহার ছিল।' পানিণির ব্যাকরণে প্রাচীন

ভারতের নিজস্ব শব্দ ও বাকরীতির স্থান ছিল না , অথবা সে স্থান ছিল গৌণ। প্রাকৃত স্তরে আমরা সে সব শব্দ অনেক পাই, এবং সম্প্রদায় বিশেষে তার চর্চা অব্যাহত ছিল বলেও প্রমাণ দেখি।

পানিণির ব্যাকরণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ব্যাকরণের ছাঁচে রচিত, যদিও ভারতীয় তথা অবৈদিক উপকরণ শেষ পর্যন্ত তিনি ছেঁকে তুলতে পারেন নি। তাকে ভাষা সংস্কারের অধীন করে নিয়েছেন; করেছেন সংস্কৃত। তৎকালীন শিষ্ট ও মান্য ভাষারূপ এবং আদর্শ ভাষারূপের সমন্বয়ে তিনি এইভাবে গড়ে তুলেছেন অনুশীলন-যোগ্য ও সংস্কৃতিচর্চার যোগ্য বাহন তথা একটি acrolect, সর্বজনীন ভাষা। সুকুমার সেন থেকে ব্লুমফিল্ড সকলেরই বিস্মিত উক্তি তাই এক : 'পানিণির ব্যাকরণ মানব মনীষার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।'

অষ্টাধ্যায়ী ঃ আটটি অধ্যায় বিশিষ্ট. ধ্বনিতত্ত্বের সূত্র সামান্য, ব্যাকরণী সূত্র প্রধান যথা শব্দরূপ, ধাতু প্রত্যায়দির পরিচয় এবং ক্রিয়ার প্রকৃতি। বাক্যতত্ত্বের সরাসরি আলোচনা নেই। কারক তত্ত্ব ও বিভক্তির আলোচনায় তবু তা সম্পূর্ণ। অর্থাৎ পদক্রম প্রভৃতির আলোচনা পানিণিতে আবশ্যকীয় বিবেচিত হয় নি। বাক্যের ধরনও নয়।

অষ্টাধ্যায়ীর আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কয়েকটি এই রূপ ভাষার বহির্ভাগীয় রূপ ছাড়াও অন্তর্ভাগীয় রূপের সত্য তিনি অনুধাবন করেছিলেন। সেখান থেকে ফিলমোর (Fillmore) এর case grammar তত্ত্বের সৃষ্টি। এছাড়া পানিণীয় সূত্র আধুনিক বিবৃতিমূলক ও বিশ্লেষণমূলক ভাষাতত্ত্বেরও গোড়াপত্তনে সহায়তা করে। পানিণির ব্যাকরণ শুধু ভাষা-নিয়ম বিশ্লেষণেই শেষ নয়, চমস্কি এবং মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের ঈর্ষা সেখানেই।

সমালোচনা ঃ বলা হয় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মূর্ধন্য বা প্রতিবেষ্টিত ধ্বনিগুলি অজ্ঞাত এবং সংস্কৃত ভাষায় এর ব্যবহার প্রচুর। এই অবস্থার হেতু ভারতীয় স্থানীয় ভাষার প্রভাব বা সামাজিক পরিবর্তন। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, সংস্কৃত ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই মূর্ধন্য ধ্বনিসমূহ. যার ওপর ষ-ত্ব বিধান, ণ-ত্ব বিধানের মত প্রধান দুটো সূত্র গড়ে উঠেছে। এই রীতি এতই কঠোর ভাবে মান্য যে এর শিথিলতায় সংস্কৃত ভাষার, বিশেষত শব্দ গঠনের ও অভিধানিক প্রক্রিয়ার বাঁধনগুলি ভেঙ্গে পড়ে এবং বাক্য গঠনেও অর্থাৎ ব্যাকরণেও এর ফল গড়ায়। অথচ বলা হচ্ছে এই জিনিসটাই অ-ইন্দোইউরোপীয় এবং সম্পূর্ণত, ভারতীয় (Indic) বৈশিষ্ট্য।

অপিচ সংস্কৃতের প্রতি ইন্দোইউরোপীয়ত্ব আরোপের বা IE ভাষাগোষ্ঠির শাখা হিসাবে সংস্কৃতের প্রতি দাবীর হেতুগুলি নিম্নরূপ :

প্রথম দাবী এর ট বর্গীয় ধ্বনি ব্যতীত অন্যান্য ধ্বনিসমূহ।

এইসব ধ্বনি খানিকটা ইন্দোইরানীয় পর্যায়ের প্রত্নভাষার উত্তর রূপ (reflex), খানিকটা আরও পূর্বরূপের বা ঐ প্রত্নরূপের নবায়ন।

(যেমন, অই > এ, ź, z´h > বিসর্গ ইত্যাদি এবং রূপতত্ত্বে বিকরণ স্বরূপ বিভক্তিপূর্ব শব্দমূলীয় প্রত্যয় যোগ ইত্যাদি এবং সামগ্রিক ভাবে প্রত্যয়ান্তিক গঠনরূপ।)

৫. তুলনামূলক তথা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বে গ্রীক-সংস্কৃত ও হিট্টির অবস্থান

যাইহোক, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের জন্মলগ্নে সংস্কৃতের আবিষ্কার একটি মহৎ ঘটনা। যে প্রাচীন ভাষার সন্ধান তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একটি লক্ষ্য ছিল, সংস্কৃত ছিল তার পথ প্রদর্শক। উ. জ্যাকসনের এটা কোনও উচ্ছ্বাস ছিল না যখন তিনি বলেছিলেন, 'comparative philology was born on the day when Sanskrit was opened to the eyes of the Western world'. পরে ১৭৮৬ সালে (স্যার) উইলিয়াম জোনস তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা , পাঠ এবং বিশেষত শকুন্তলার অনুবাদের আনন্দ পেরিয়ে সংস্কৃত ভাষার গঠন, প্রাচীনতা বা উৎস নিয়ে প্রবাদতুল্য বাক্য ব্যবহার করলেন ('wonderful structure,more perfect than the Greek, more copius than the Latin, and more exquisitely refined than either') এবং প্রত্নভাষায় সন্ধানে ('common sources, which perhaps no longer exists.') সংস্কৃত পঠনপাঠনের প্রতি পশ্চিমের দৃষ্টি পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়াসী হলেন।

কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সৌন্দর্য, শক্তি ও নির্ভুল প্রাচীন গঠন পশ্চিমে সহজ দৃষ্টিতে গৃহীত হতে পারে নি, এই ভাষাকে তারা মনে করলেন "a forgery made by the crafty Brahmans on the model of Greek after Alexander's conquest." (উদ্ধৃতি, তারাপোরওয়ালা ১৯৬২ :888)। এর অর্থ পশ্চিমে তখন সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে ঈর্ষা এবং অপ (ভুল) ধারণা কাজ করছিল। ফলে উইলিয়াম জোনসের এ নব আবিষ্কারে কেউ খুশী হন নি, বরং সংস্কৃতকে যথা মূল্যায়নের চেষ্টা করে ও গ্রীক লাতিন প্রভৃতি ভাষার জ্যেষ্ঠা ভগিনী রূপে প্রতিপন্ন করে, তথা, অন্যতম প্রাচীন উৎস-ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করে (স্যার) উইলিয়াম জোনস তাঁর স্বজাতির ভৎর্সনাই পেয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য, জেমস মিল প্রণীত History of British India)। ইউরোপীয় বিদ্যাচর্চায় সংস্কৃত-চর্চা অবহেলিত। সেখানে গ্রীক- লাতিন নির্ভরতাই অধিক। এমন কি যেখানে সংস্কৃতের উপস্থিতি অবধারিত সেখানেও গ্রীক-

এর বিকল্প ভাবা হয়। গ্রীক ভাষাতেই প্রাচীন ভাষারূপ, বিশেষতঃ স্বর সর্বাপেক্ষা অবিকৃত রয়েছে, এ বিশ্বাসই তার মূল। হিট্টি ভাষা আবিষ্কারের পর (১৯১৫,পরে দ্রষ্টব্য) এই বিকল্প চিন্তায় আরও জোর পড়ে। কিন্তু মস্তিস্ক ব্যায়াম এক জিনিস আর সত্য অন্য জিনিস। আধুনিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও পুনর্গঠন তত্ত্বে সংস্কৃত-নির্ভরতা প্রায় অবিকল্পযোগ্য। দেরীতে হলেও সেকথা পরে সকলের কাছেই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। সংস্কৃত ভাষায় লভ্য তথ্য ব্যতীত ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার প্রকৃতি ও বিবর্তন জানা বা বোঝা হয় অসম্পূর্ণ কিংবা অসম্ভব।

সংস্কৃত ভারতীয় (Indic) ভাষা হলেও এটা আর্যদেরই ভাষা। আর্যদের মূলভাষার নাম ইন্দো-ইউরোপীয় (অবশ্য এক সময় ১৮১৩-১৮৭৮, 'ইন্দো-জার্মান' কথাটা বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল।)। এটা অবশ্য কল্পিত নাম (ইন্দো-ইউরোপীয়), এর উদ্ভাবক ছিলেন টমাস ইয়ং (১৮১৩)। আশীর দশকে (১৮৭৮) ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুর বুঝে শুনে শব্দটি ব্যবহার করেন,-যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম এবং সরাসরি ভারত এবং ইউরোপের ভাষাসমূহের সম্পর্কের অসুবিধার কথা মনে রেখেই। ইউরোপ অবশ্য ষোড়শ শতক থেকে সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং সম্ভবত. সংস্কৃতকে ইউরোপীয় ভাষার উৎস বা অন্যতম উৎস বলেও ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু (স্যার) উইলিয়ম জোনসই তার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাটি উপস্থিত করেন এবং তার একশত বছর পর কার্ল বার্গম্যান, দেলব্রুক এবং আরও কিছু পরে ফ্রাঞ্জ বপের চেষ্টায় ইন্দোইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব (IE-philology) পুনপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের কারণে ও এঁদের প্রচেষ্টায় কালক্রমে এটা বোঝা সহজ হয়ে আসে যে ইন্দোইউরোপীয় ধ্বনিসমূহ এই সব শাখা ভাষায় যৌথ রক্ষিত (shared retentions) ও যৌথ নবসৃজিত বা নবায়িত (shared innovations) হয়ে আছে।

বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর যেমন আধুনিক কাব্যের জন্মলগ্ন সূচিত হয় বলে ধরা হয়, তেমনি অত্যুৎসাহী তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিকগণ তেমনি ভাষার বংশ-বৃক্ষতত্ত্বের উদগাতা শ্লাইশারের মৃত্যুর বছর (১৮৬৮) থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্বের জন্ম বলেও উল্লেখ করতে চান। যাই হোক, সংস্কৃতকে বাদ রেখে এ তত্ত্ব অগ্রসর হতে পারে নি[৫]। বিচ্ছিন্ন কিছু আলোচনা বাদ দিলে বিংশ শতকে এসে ফ্রাঞ্জ্ বপ্ই সংস্কৃতকে পুনরালোচনায় ও তুলনায় নিয়ে আসেন, প্রথমে ১৮১৫ সালে তাঁর তিন খণ্ডে রচিত গ্রন্থে এবং পরে, তাঁর ১৯ বছরের গবেষণার মহাফসল অপর একটি গ্রন্থে, ১৯৩৩ সালে। ১৯০০ সালে দেলব্রুক বা তার সামান্য আগে ব্রুগমানের গবেষণারই এক পূঞ্জিভূত ফসল ছিল এগুলি।

(৫ ক) লুপ্ত সভ্যতার ভাষা বনাম সংস্কৃত
(*'সংস্কৃত'* সমস্যা হল কেন?) :

বপ্ যখন সংস্কৃত চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ইউরোপবাদীগণের তথা পাশ্চাত্য জ্ঞানবাদীগণের সামনে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন দলিলগুলি উপস্থিত হয়। অর্থাৎ কাপ্পাদেকিয়ায় (এশিয়া মাইনর) প্রত্নলেখ আবিষ্কৃত হয় এবং তাতে হিট্টিদের ভাষারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আগেই দ্য সস্যুর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বা প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুনর্গঠন সমস্যায় একটি লুপ্ত ভাষার অস্তিত্ব সন্দেহ করেছিলেন. প্রাপ্ত প্রত্নলেখের মধ্যে প্রথম সেই অনুমিত লুপ্ত হিট্টি ভাষার পুনরুদ্ধার ঘটে ও পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন লিখিত ভাষার প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাতে পাশ্চাত্যজ্ঞানবাদীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তাদের ধারণা হয়, ভারতীয় ভাষার ওপর পূর্ববৎ গুরুত্ব না দিলেও এখন চলতে পারে, কারণ প্রত্ন ভাষা পুনর্নির্মাণের সমস্যাগুলির সমাধান হিট্টি এবং বাকীটা গ্রীক ভাষাতেই পাওয়া সম্ভব।

এই ধারণার ভ্রান্তি কোথায় তা এখানে হিট্টি ভাষা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে লভ্য তথ্যগুলি থেকে বোঝা যেতে পারে। হিট্টিয়দের কথা প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বাইবেলে। পরে কিউনিফর্ম বা বাণমুখ লিপিতত্ত্বের ইতিহাসে এদের কথা জানা যায়। মিশরীয় কিছু সূত্রে জানা যায় যে মিশরাধীন সিরিয়া সীমান্তের দিকে এক বিস্তীর্ণ যুদ্ধ এলাকায় ফেরাওদের ওপর তারা প্রায়ই আক্রমণ চালাতো। এই যুদ্ধ এলাকাগুলিতে অনবরত যুদ্ধ লেগে থাকতো বলে তাকে বলা হতো যুদ্ধের দেশ (land of Hatti)। আর শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধাদের বলা হতো হেতা (Heta)। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে ফারাও খত্মোসিস এই যুদ্ধবাজ গোষ্ঠীটির সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তী ইতিহাসে, অপর একটি খোদিত প্রস্তরের ভিত্তিতে জানা যায়, ফারাও আখনাতন সিংহাসনে আরোহন করলে হাতির এক রাজা (King of Hatti) তাঁকে অভিনন্দন জানান। এই ভাবে দেখা যায় হিত্তিরা একটা ক্ষুদ্র যোদ্ধা গোষ্ঠী (tribe) থেকে পরে যথেষ্ট প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন এবং নিজস্ব সভ্যতাও গড়ে তোলেন। তাঁদের মুদ্রা, দেবমূর্তি, রথচিত্র প্রভৃতি উন্নত কারুকাজ এবং ভাস্কর্য সেই চিহ্ন বহন করে। এই সভ্যতাকে এখন বলা হচ্ছে 'vanished civilization'। এটা আনাতোলিয়া বা বর্তমান তুরস্কের প্রধান অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। কোনও কোনও প্রস্তরে আরযাওয়াদের প্রসঙ্গ ছিল; আরযাওয়াদের রাজ্য প্রথমে আবিষ্কার করা যায় নি। পরে আরও পশ্চিমাংশের ভুমিকে ঐ নামে চিহ্নিত করা হয়। বাণমুখ লিপির প্রস্তর খণ্ডগুলি প্রথমে পাওয়া যায় উত্তর সিরিয়ায়, পরে আনাতোলিয়ায়। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রস্তরসমূহ ও তথ্য ভিত্তিতে ব্রিটিশ পণ্ডিত আর্চিবল্ড হেনরি সেইস (Sayce) যে ভাষ্য উপস্থিত করেন, তাতেই তিনি হারানো

আনাতোলিয় সাম্রাজ্যের সাথে এসব উপকরণের সম্পর্কের কথা অনুমান করেন। পরে রলিনসন (Rawlinson) এবং জনৈক ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণায় আরযাওয়া (Arzawa) দের দেশ এবং আনাতোলিয়ার বিস্তৃত তথ্যই জানা যায় এবং আরযাওয়া ভাষারও পুনঃনামকরণ করা হয় হিট্টি।

কাপ্পাদেকিয়া এবং অন্যান্য খনন স্থানে যে সব প্রত্নলেখ আবিষ্কৃত হয়, তা যে বাণমুখ লিপিতে লিখিত হয় তা' মিশরীয় বণমুখ লিপি থেকে ছিল ভিন্ন। কিন্তু সৌভাগ্যত দোভাষী প্রক্রিয়ায় লিখিত কিছু উপকরণ আবিষ্কৃত হলে হিত্তি বা হিট্টি ভাষার (খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দ) উল্লেখ বা সন্ধান লাভ সহজ হয়ে পড়ে । এই ভাষার সন্ধান নিতে গিয়ে দ্য সস্যুরের অনুমান সত্য প্রমাণিত হয় ও তখন থেকে (১৯১৫-) কিছুকাল ইন্দো-হিট্টি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সস্যুরের উল্লিখিত অনিয়মগুলির ব্যাখ্যা সন্ধানের লক্ষ্যে হিট্টির শাখাভাষা আনাতোলিয়ার প্রতি খুব ঝোঁক পড়ে।

হিট্টি ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে সব তথ্য হাতে আসে তা সুকুমার সেনের (১৯৭৯ঃ৮৭) ভাষায় নিম্নরূপ:

> "ইন্দো-ইউরোপীয় অপর ভাষাগুলির তুলনায় হিট্টীয় ভাষায় ধ্বনি সংখ্যা কম তো নয়ই। বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ (খ থ ফ)ও চতুর্থ বর্ণ নাই। অধিকন্তু ছিল দুইটি কণ্ঠনালীয় (laryngeal) ধ্বনি।একটি অঘোষ অপরটি সঘোষ। "

হিট্টি ভাষার প্রতি আকর্ষণের কারণ ছিল প্রধানত এই হলকীধ্বনি বা 'কণ্ঠনালীয়' (কণ্ঠতন্ত্রীয়, Laryngeal) ধ্বনি এই জাতীয় ধ্বনি উত্তর আমেরিকার শুস্বাপ ভাষা কিংবা সেমিয় (আরবী) ভাষাতে আগে লক্ষ্য করা গিয়েছিল; ইন্দো-ইউরোপীয় কোনও ভাষায় এই প্রথম দেখা গেল। এর আগে এই ধ্বনির কথা শোনা যায় নি বা হিট্টির পরে আর কোনও ইন্দো-হিট্টি বা ইউরোপীয় ভাষায় রক্ষিত বা নবসৃজিত (innovated) হয় নি। অথচ ইন্দো-ইউরোপীয় এবং প্রত্ন -ইউরোপীয় ভাষার পুনর্গঠনে এই ধ্বনি ছিল অত্যাবশ্যক। ফলে শুধু হিট্টি-চর্চাই নয়, গ্রীক ভাষার পুনচর্চার ওপরও জোর পড়ে বা এ প্রসঙ্গ গুরুত্ব পায়। এছাড়া তখন পর্যন্ত এ ধারণাও বদ্ধমূল ছিল যে গ্রীক ভাষায়ই প্রাচীন স্বর সর্বাধিক অপরিবর্তিত। মস্তিষ্ক চর্চার এরূপ ভ্রান্তির কারণে সংস্কৃত ভাষার চর্চা কিছুকাল ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সংস্কৃত সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধরণাও কাজ করতে থাকে।

(৫. খ) হিট্টিভাষার প্রাসঙ্গিকতা :

কিন্তু তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের যে অগ্রগতি এই সময় ঘটে, এটা অনেকটা তারই শাপে বরও বলা চলে। কারণ দেখা গেল অভ্যন্তরীণ তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে প্রাচীন ভাষার ধ্বনির আলোচনা বা পুনর্গঠন খুব সহজ নয়। দ্য সস্যুর

অক্ষর গঠনের ক্ষেত্রে * es (is), *de (give, দান) প্রভৃতি কিছু শব্দে দ্ব্যক্ষর গঠন রীতি দেখে তাকে প্রাচীন রীতির ব্যতিক্রম মনে করলেন। পরে হিট্টি ভাষা আবিষ্কৃত হল, সস্যুরের অনুমান সত্য হল, কিছূ সমস্যার সমাধানও ঘটে গেল,-কিন্তু তথাপি বিশেষত কণ্ঠতন্ত্রীয় ধ্বনির বিষয়ে শেষ কথা জানা সম্ভব হয় নি,--গোল আরও বেড়ে জটিল আকার নিল। যেমন কণ্ঠতন্ত্রীয় ধ্বনির গঠন, উচ্চারণ স্বরূপ, বিবর্তনরূপ ও সহধ্বনিগুলি না জেনে প্রত্ন-ভাষার সাথে তার সহোদরা ভাষাগুলির সম্পর্ক নির্ণয়ে বা উত্তর রূপগুলির বংশানুক্রমিকতা বিচারে নিশ্চিত বিবরণ দান অসম্ভব হয়ে উঠল।

কণ্ঠতন্ত্রীয় ধ্বনি (Laryngeals) কখনও স্বরধ্বনি পর্যায়ের, কখনও ব্যঞ্জন, কখনওবা স্বর (accent)- মাত্র রূপে এপর্যন্ত আলোচিত হয়ে এসেছে। গ্রীকবাদী, হিট্টিবাদী ও অন্যান্য আলোচকগণ অনেক তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় আর্য (তথা ইন্দো ইউরোপীয়) ভাষার সম্প্রসারের কথা বাদ দিয়ে কোনও সুষ্ঠু তাত্ত্বিক বা বাস্তব ধারণায় কেউ পৌছতে পারেন নি। এখন মস্তিষ্ক-কর্ষণ বাদ দিয়ে তাঁরা বাস্তব প্রমাণের জন্য সংস্কৃতের দিকে মুখ ফেরানোর কথা ভাবতে শুরু করলেন। নতুন ভাবে সংস্কৃতের মুল্যায়ন এজন্য অবধারিত হয়ে উঠলো। অর্থাৎ গ্রীক ভাষা মূল ভাষার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকবে এটা মেনে নিয়ে (বা ধরে রেখেই) laryngeal-তত্ত্বের সমাধানের জন্য যাঁরা বাইরে থেকে সেমিটিক ভাষার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার কথা ভাবছিলেন, তাঁরা অবশেষে, সংস্কৃত ভাষার প্রসঙ্গেও ঢুকতে তেমনি বাধ্য হলেন। এখানে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

সংস্কৃত ও ইন্দোইউরোপীয় ভাষার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে এ যাবৎ যে সব ধারণা কাজ করছিল, সেগুলিতে বহু অস্পষ্টতা বিদ্যমান ছিল। বিশেষজ্ঞগণের আলোচনায় কয়েকটি বিষয়ে যেমন সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল, পুনর্গঠন তত্ত্ব তথা তৌলন আলোচনার ক্ষেত্রেও তেমনি বহু তথ্য ও প্রমাণপঞ্জির অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সংস্কৃতকে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন বা তার সমকালীন ভাবারও প্রবণতা তখন অনেক ক্ষেত্রে ছিল প্রবল। যাই হোক, শেষে যে মতগুলি স্পস্ট হয়ে ও সর্বতোভাবে গৃহীত হয়ে ওঠে এবং প্রয়োগে বা উল্লেখক্রমে প্রাধান্য পেতে থাকে, সেগুলি নিম্নরূপ:

(১) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় প্রত্ন শব্দগুলোর ধ্বনি পুনর্গঠনে প্রধান সূত্রগুলির ইঙ্গিত সংস্কৃতে লভ্য।

(২) রূপতত্ত্বে প্রাচীন ভাষার অপশ্রুতি (ablaut) সমস্যা চিহ্নিত করনে এবং ধ্বনির গুণ ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের রূপান্তরে ("স্বরূপ পরিবর্তন") সংস্কৃতের গঠনসমূহ চমৎকার সমাধানস্থল।

(৩) এছাড়া বাক্যতত্ত্বেও পুরনো ক্রিয়ারূপের জটিলতার ব্যাখ্যগুলি সংস্কৃত ক্রিয়ারূপ গঠন-বৈচিত্র্যের সমান্তরাল।

কণ্ঠতন্ত্রীয় ধ্বনির তত্ত্বের জন্য সংস্কৃতকে এখানে জড়াবার কারণ 'জ্যেষ্ঠা -ভগিনী'-র দাবী নয়, এই কারণ ধ্বনিতাত্ত্বিক। বাংলায় যেমন ক্রিয়ামূলরূপ (কর, দেখ্‌, মার, নে, আন. প্রভৃতি) একাক্ষরিক, প্রত্ন ইউরোপীয় ভাষার ক্রিয়ারূপমূলও তাই। এটাই আবার মৌল গঠন অর্থাৎ, সব ধরণের শব্দেরই মূল গঠনরূপ। যেমন *ভের (আনা), *মেড (মাপা) ইত্যাদি। এখানে বৈশিষ্ট্যটি হল শব্দগুলো তিনটি ধ্বনির সমন্বয়ে হয়- একটি ব্যঞ্জন, একটি স্বর এবং শেষে আবার একটি ব্যঞ্জন, (CVC গঠন)। কিন্তু দেখা গেল কিছু কিছু শব্দের ক্ষেত্রে একটি ব্যঞ্জন লুপ্ত হয়েছে বা সেটি বিবর্তিত হয়ে স্বরকে পরিবর্তিত করেছে। এখানেই মধ্যবর্তী একটি ভাষার অস্তিত্বের কথা প্রথমে আসে এবং দ্য সস্যুরের সন্দেহ সত্য প্রমাণ করে একদিন হিট্টি ভাষা আবিস্কারও হয় (পূর্বে উল্লিখিত, পরেও আরও উল্লেখ আসবে)। কিন্তু অক্ষর গঠনের যে নিয়ম — ব্যঞ্জন (C) স্বর (V) ব্যঞ্জন (C)এবং স্বর (V) প্রায় ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত /e/ (অর্থাৎ, CeC) তা আরও জোরদার হল মাত্র, কিন্তু পরিবর্তিত বা অবলুপ্ত ব্যঞ্জন (C) -এর কোনও ব্যাখ্যাই স্পস্ট হল না।

যাই হোক, হিট্টি-সূত্রে ১৯২৭ সালে একটি h-ধ্বনির অস্তিত্বের কথা জানা যায় এবং ক্রমে তা আরও স্পস্ট হয়ে ওঠে। ফলে সেমিয় (আরবী) ভাষার ধরনে একে কণ্ঠনালীয় ধ্বনি হিসাবে ব্যবহার করে কিছু সমস্যার সামাধান করাও সম্ভব হয়। তখনই এই ধারণা আরও দৃঢ় হয় যে প্রত্ন-হিট্টিতে পুরঃকণ্ঠ ধ্বনি ছিল যার উত্তররূপ (reflexes) এশীয় আর্যভাষাগুলিতে আর সংরক্ষিত হয় নি।

অবশ্য এই ধ্বনির কিছু ব্যবহার বৈচিত্র্য সম্পর্কে ইতোমধ্যেই ধারণার আরও সম্প্রসারণ ঘটে। অন্যান্য পূর্ব অজ্ঞাত ভাষা থেকেও গল বা কণ্ঠনালীয় ধ্বনিরূপের ব্যবহারিক তথ্য আহরিত হয় এবং তখন বলা হয় যে এই পুরঃকণ্ঠধ্বনিটি (বা ধ্বনি সমূহ) আরবি ইত্যাদি সেমিয় ভাষার বা উত্তর আমেরিকার শুস্বাপ ভাষার গলবিলীয় ও বিশেষ কণ্ঠতন্ত্রীয় ধ্বনির সমান্তরাল এবং এর বৈচিত্র্যগুলি (বা সহরূপ গুলি) সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব। এই ভাবে তখন থেকে মূল ধ্বনিটি সাধারণতঃ বড় অক্ষরের /H/ বা অন্য কোনও অক্ষর দ্বারা এবং কখনও স্বোয়াচিহ্ন/∂/ দ্বারা দেখানো হতে থাকে। এর বৈচিত্র্যগুলি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত করেও তার নীচে নীচে দাগিয়ে বোঝানো হতে থাকে, যেমন H_1 H_2 এবং H_3 কিংবা ∂_1, ∂_2 প্রভৃতি।

অর্থাৎ CVC গঠনমূলের V যেখানে (e) থাকার কথা , সেখানে তার সম্মুখবর্তী ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়ে (অ) কিংবা (ও) ধ্বনিতে পরিবর্তন হতে দেখা যেত। এই নিয়মিত পরিবর্তন ছাড়াও ব্যঞ্জন পূর্ব অবস্থানে আশ্রিত স্বর দীর্ঘ হতো এবং আন্তঃব্যঞ্জন অবস্থানে নিজেই স্বরধ্বনির রূপ বা উচ্চারণ পরিগ্রহ করতো। এরূপ

ক্ষেত্রে সংস্কৃতে ই অথবা বিকল্পে উহ্য হয়। -এই সব পরিবর্তনের কারণ আর অজ্ঞাত রইল না। এগুলি কণ্ঠনালীয় ধ্বনির পূর্ব অস্তিত্বেরই উত্তররূপান্তর মাত্র।

সম্প্রতি Beekes এই মত ব্যক্ত করেছেন, পুরঃকণ্ঠ ধ্বনিতত্ত্বের জন্য হিট্টিয় ভাষা অবধারিত কিছু নয়। হিট্টি আবিষ্কারের আগেও ভাষাপণ্ডিতগণ এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তখন তাঁদের ভিত্তি ছিল গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা। এখন গ্রীক-সংস্কৃতের সম্পর্কটুকু পরিষ্কার হলে বাকীটুকুও জানা সম্ভব। এই ধারণাবশত তিনি হিট্টিকে বাদ রেখেই কিছু শব্দের (যেমন 'পিতা' ইত্যাদি) প্রত্নরূপ নিয়ে ভাবেন। তাঁর পুনর্গঠন তত্ত্বের সূত্র নিম্নরূপ :

SK.	GK.	Latin	Gothic	*PIE
pitár-	patér	pater	fadar	ph_2 tér

বস্তুত সংস্কৃত ই ও অন্যান্য ভাষার অ আসলে হ্রস্বস্বর (স্বোয়া 'Schwa'), গাথা-আবেস্তায় বা প্রত্ন- ইরানে এটি লুপ্ত (pta) এবং স্বরধর্ম (বা অক্ষর চূড়া) হীন।

বীকেস এই বৈশিষ্ট্যকে ব্যঞ্জন-নিত্য বলেছেন এবং H এবং পরিবর্তে x অথবা h ব্যবহার করেছেন। তিনি স্বোয়া বা ə ধ্বনি ব্যবহারের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করে দেখিয়েছেন এই পুরঃকণ্ঠধ্বনি কোনও হ্রস্বস্বর নয় এবং এটি সর্ব-অবস্থানে ব্যবহারযোগ্য একটি স্বাধীন পূর্ণ ধ্বনিরূপ। অর্থাৎ এটি একটি ব্যঞ্জন ধ্বনিমূল।

এই রূপ আলোচনায় হিট্টি অপেক্ষা সংস্কৃতের প্রাধান্য স্পস্ট। তবে এই প্রাধান্যের কারণ ছিল আরও, যেমন ঃ

> যে ধ্বনি সর্বদা স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় না (ধ্বনি লোপ হয়), অথচ তা অপশ্রুতি (ablaut) ধর্মী স্বরূপ পরিবর্তনও করে না, তার একাধিক স্বরূপ ব্যবহার সংস্কৃতে দেখা যায়, যথা-

বণিতা	কিন্তু	বনতারঃ	(বচনাধিক)
সখা	কিন্তু	সখ্যে	(সম্প্রদান- সম্বন্ধীয় কারক)
দেবত্ত	কিন্তু/এবং	গত্ত	(* দ-তি> দত্ত, * ভগদ-তি)

এসব ক্ষেত্র স্বরধ্বনিস্থলে হসন্তরূপ (যথা, বন্-), দ্বিত্বরূপ (যথা , ত্ত) কিংবা সংযুক্ত রূপ(যথা খ্য) প্রভৃতির ব্যাখ্যায় যে অনিয়ম ছিল তা এখন Laryngeal তত্ত্বের আওতাধীন বলে গণ্য হয়েছে। এর ভিত্তিতেই রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এখন পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে, ইন্দো-ইউরোপীয় কিংবা প্রত্ন-ইউরোপীয় ভাষায়

বিশেষ্যপদে যুক্ত প্রত্যয় বিভক্তির রূপসমূহ (Inflections). বিশেষত কারক-লিঙ্গ-বচন ইত্যাদির ব্যবহার অনেকটাই সংস্কৃতে সংরক্ষিত, অর্থাৎ সংস্কৃতে লভ্য উত্তর রূপ (reflexes) থেকে তা' পুনর্গঠনযোগ্য। তাতে দেখা যায় বিশেষণ বিশেষ্যেরই ব্যাকরণী বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সমতা বিধান করতো এবং ক্রিয়ারূপ (verb system) খুব জটিল ও বৈচিত্র্যশালী। বিশেষ্যের পুরুষ বচন লিঙ্গাদির সঙ্গে এই সমতা বিধান নীতিতে উক্তি, ভাব ও কাল ইত্যাদি প্রকাশবৈশিষ্ট্য বোঝাতে যে সব চিহ্ন ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতো এগুলি সংখ্যায় ও ব্যাকরণী প্রক্রিয়ায় থাকতো বহু। 'অপশ্রুতি' এবং স্বরক্রমগত 'স্বরূপ পরিবর্তন' তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য। এখন তার সাথে পুরঃকণ্ঠ ধ্বনির জটিলতার বিষয়টিও যুক্ত হল সংস্কৃতের সাথে।

বাক্যতত্ত্বেও যাঁরা সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ গঠনকে অধীন বাক্যের আদিরূপ প্রমাণ করেন তাঁদের মধ্যে লেহ্‌ম্যান *PIE* ভাষাকে যে *OV* গঠনের ভাষা (অর্থাৎ আগে কর্ম পরে ক্রিয়া) বলে সনাক্ত করেছিলেন, সেটি সম্ভব হয়েছিল সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধবাচক যোযক অব্যয়যুক্ত খণ্ডবাক্য ও তার ধর্ম দেখে। অবশ্য লেহম্যানের তত্ত্বে যে ভুল ছিল সেটা কস্‌টেলো (John R Costello) দেখিয়েছেন। লেহ্‌ম্যানের ধারণা ছিল যদি কোনও বিশেষ্য পদবাক্যের (NP) বিশেষ্যের সাথে কোনও পরিপূরক উপবাক্যের সংযোজন (clause complement) হয়, তবে তা, সম্বন্ধবাচক গঠনের রূপ নেয়। যেমন, সংস্কৃতে :

যাম যজ্ঞ ম পরিভূরসি স ইদ দেবাষু গচ্ছতি

(অর্থাৎ, যে যজ্ঞোপাচার তুমি পরিবৃত করে রাখ তা দেবতার দিকে সত্যগামী)।

হিট্টি ভাষায়ও এর ব্যতিক্রম নেই, যেমন :

নূ-যা (দ) উতু (শি) কুইন ... ইত্যাদি।

(অর্থাৎ, এখন + সম্বন্ধবাচক সর্বনাম / সূর্য / যা / অসামরিক যুদ্ধবন্দী / তে/ রাজপ্রাসাদ এনেছিল / এবং +তা ১৫,৫০০/ অসামরিক বন্দী/ হয় = (এবং যে অসামরিক যুদ্ধবন্দীদের আমি, সূর্য, রাজপ্রাসাদে রেখেছি, সেই যুদ্ধবন্দীদের সংখ্যা হচ্ছে ১৫, ৫০০।)

সম্বন্ধবাচক বাক্যগঠনটি এখানে একটি উপবাক্য সংযোজনবিশেষ এবং এটির সাথে বিশেষ্যপদীয় গঠনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

অবশ্য ১৯০০ সাল বা তারও আগে থেকে পন্ডিতগণের ধারণা ছিল, প্রাচীন কালে বিশেষ্য-নির্ভর বাক্য হতো এবং বিশেষ্যেরই স্বাধীন সম্প্রসারক হতো সেগুলি। দেলব্রুকেরও এই ধারণা ছিল। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা বোঝা যায় নি। তবে অনেকটা এরূপ ছিল যে প্রধান NP-র সাথে এই স্বতন্ত্র স্বাধীন অযুক্ত বাক্যখন্ডের মধ্যে

সম্পর্কটা ঠিক দূরান্বয়ীর মত নয়। অর্থাৎ প্রাচীন ভাষা শুধুই অযুক্ত স্বতন্ত্র বাক্যখণ্ডের সমষ্টি নয়, তবে ক্রিয়াপদে সমাপিকার ভাব থাকতো। দেলব্রুক আরও বলেছিলেন, খণ্ড বাক্যগুলিতে সম্বন্ধপদ থাকতো না, স্বাধীন বাক্যখণ্ড দ্বারাই সম্বন্ধটা সূচিত হতো।- "সে বলে, এটা ভাল" এই জাতীয় গঠনে এখনও যেমন তার ভাবটা আধুনিক কিছু কিছু ভাষায় দেখা যায়।

কিন্তু হির্ট (Hirt) 'বিশেষ্যের' ব্যাখ্যায় বিশেষ্য পদবাক্যের গঠন নিয়ে কথা তোলেন। তিনি বলেন যে সম্বন্ধ সূচনা কোনও একটা গঠন দ্বারা হতো, যদিও তা স্পষ্ট নয়। অবশ্য তিনি বিলোপন (deletion rule) সূত্রের মত কোনও সূত্র উল্লেখ করে দেলব্রুকের সমর্থন করতে চান নি বা উপরিস্তরের (প্রকাশ) বা (surface level) গঠনের কথাও বলেন নি। তিনি যে গঠনের কথা উল্লেখ করেন তাতে পাশাপশি বাক্যখণ্ডগুলি স্বাভাবিক অন্বয় প্রক্রিয়া উৎপন্ন করতো। এই প্রক্রিয়ায় সহায় থাকতো বিশেষ্যেরই একটি সম্প্রসারিত গঠন। এই গঠনটি বিশেষ্যের নির্ভরতায় 'আবশ্যিক' ছিল না। তিনি হোমরের বাক্যগঠন প্রক্রিয়ার সূত্র টেনে তাঁর মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং বৈদিক ভাষাতেও প্রায় একই গঠনের উপস্থিতি দেখাতে সক্ষম হন। নির্ভর বাক্য হোমরে এবং বেদে প্রায় একই রকম দেখতে। এখানে ক্রিয়ার অবস্থানটিই মুখ্য।

চল্লিশের দশকে এসে নামপদের পরিবর্ধনরূপ (nominal modifiers) ও বিশেষ্যের বহুবচনযুক্ত পদ গঠনের ক্ষেত্রে স্বাধীন বাক্যখণ্ডের উপস্থিতি চিন্তা করা হয়। বাক্যের অন্বয়ে স্বাধীন বাক্যের গঠনতত্ত্বটি বুঝে নেওয়া জরুরি হয়ে ওঠে। কিন্তু তখন কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি, হয়েছে আরও ৪০ বছর পরে। আগেই বেদ ও গ্রীকে ক্রিয়ান্ত্য গঠন ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে একদল একটা পর্যায়ে চলে এসেছিল। এখন আরও স্পষ্ট হল যে ক্রিয়ার আগে কর্ম বা object+ verb একটা বিশেষ ভাষার শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য। একে *OV* ভাষা বলা যায়। এই ভাষার সাধারণ নিয়ম এই যে এতে নির্ভর বাক্যখণ্ড সম্প্রসারকের বিশেষ্যের সাথে যুক্ত থাকে এবং ক্রিয়ার গঠন থাকে সমাপিকার মত।

ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে এই সাধারণীকরণ সূত্রে আমরা সহজেই উপনীত হতে পারি যে সমন্ধবাচক গঠনটি PIE (প্রত্ন-ইন্দোইউরোপীয়) ভাষাতে ছিল, কেননা তার সকল শাখায় উত্তরকালে উত্তররূপে (reflex) তা' একইভাবে গঠিত হয়েছে। যেমন , সংস্কৃত ও হিট্টি ভাষায় যেভাবে থাকার কথা, সেভাবেই আছে। ঘুরিয়ে বললে, অতএব, এই সংস্কৃত-হিট্টি রীতি প্রত্ন-ভাষারই উত্তর রূপ। প্রত্নভাষায় সম্বন্ধ বাচকরূপ অনিবার্য। আর তা'হলে এটাই সর্বপ্রাচীন অধীন বাক্য খণ্ড।

এই সব প্রমাণে তাই বলা যায় প্রত্ন-ভাষার সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক দূরাগত নয়। যারা সংস্কৃত ব্যতিরেকে পুনর্গঠন তত্ত্বের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন, তাঁদের ভ্রান্তি ছিল এখানেই । গ্রীক ও হিট্টির অতিরিক্ত তথ্যই শুধু নয় , সন্দেহজনক যে কোনও উপাত্তেই নির্ভরতা মিলেছে এই সংস্কৃত-মূলে বা সূত্রে। পুনর্গঠন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিকতা, সর্বজনীনতা আবার প্রতিষ্ঠিত হল। পুনর্গঠন পদ্ধতির প্রতি ভাষাবিজ্ঞানীদের আস্থা পুনঃস্থাপিত হলো।

৬. পুনর্গঠনতত্ত্বের সম্প্রসার ও বাংলা ভাষার প্রাসঙ্গিকতা

পুনর্গঠন পদ্ধতির ইতিহাস পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক আশ্চর্য ইতিহাস। পরবর্তীকালে রোমান্স ভাষাগুলির প্রত্নরূপ পুনর্নির্মানে যে সাফল্য ঘটে এবং আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসবিহীন ভাষাগুলির প্রত্ন রূপ নির্মাণ ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা এলাকার বাইরে ভাষা বংশপীঠিকা নির্মাণে গ্রীনবার্গ ও অন্যান্যদের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অগ্রসরতা পায় তা ভাষাতত্ত্বের বিকাশের ইতিহাসকে খুবই সমৃদ্ধ করে । সৃষ্টিশীল পদ্ধতিতেও পুনর্গঠনতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। ঐতিহাসিক তৌলনপদ্ধতির ভাষাতত্ত্বের এটা অপ্রত্যাশিত এক বিজয় (দ্রষ্টব্য, রবার্ট কিং)। আঞ্চলিক ভাষাসমূহে এর প্রয়োগ বিষয়ে অতঃপর মনঃসংযোগ ঘটতে থাকে। বাংলাভাষার কথা সেখানেই প্রাসঙ্গিক।

বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক বিকাশের স্তরগুলি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করেছেন এবং তন্মধ্যে বহিরোপাদান ও অন্তঃশীলা স্রোতের সহাবস্থানের ইতিহাসও উল্লেখ করে গেছেন। এরপর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ইতিহাস রচনা করেন। তাতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বহু শব্দের বুৎপত্তি, বিশেষতঃ সর্বনামপদ, বহুবচনের রূপ, কারক বিভক্তি, ক্রিয়ারূপ, সংখ্যাশব্দ সম্পর্কে নিজস্ব বুৎপত্তি দিয়েছেন। এই শব্দের প্রত্নরূপ পুনর্গঠনকালে তিনি অভ্যন্তরীণ প্রমাণ ও বহিঃপ্রমাণ দুইই উপস্থিত করেছেন। তদতিরিক্ত তিনি দ্রাবিড় প্রভাব সম্পর্কে গোড়া মন্তব্য প্রদান করেন ও মুন্ডা ও সাঁওতাল প্রভৃতি অষ্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণী প্রভাবের কথা বিস্তারিত উল্লেখ করে আর্য-অনার্য ভাষার দ্বিস্তরী (sub-stratum তত্ত্ব অনুযায়ী)গঠনের কথা বলেন। তিনি ফরাসী ভাষাতত্ত্ব চিন্তার (school of thoughts) আদর্শে বাংলাভাষার প্রত্নরূপ হিসাবে গৌড়ী প্রাকৃত ও গৌড় অপভ্রংশের পুনর্গঠন করেন ও বাংলা ভাষার জন্মসাল নানা প্রমাণ ভিত্তিতে ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ বলে নিশ্চিত উল্লেখ করেন। বাংলা ভাষার প্রত্নরূপ পুনঃনির্মানের এটাই প্রথম প্রয়াস। আধুনিক পদ্ধতিতে এই বিষয় আর যাঁদের কাজ দেখা যায়, তারা হলেন, পট্টনায়ক, মেঘাস্কুম্বুর, ঠাকুরদাস ও বর্তমান লেখক (বিস্তৃত দেখুন মনিরুজ্জামান ১৯৭৭)। তবে বাংলা ভাষার ইতিহাস নিয়ে আরও অনেকে কাজ

করেছেন যেমন, অতীন্দ্র মজুমদার, সুকুমার সেন, সুভদ্র কুমার সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, পরেশচন্দ্র মজুমদার, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, রামেশ্বর শ' প্রভৃতি।.

(৬.১) বাংলাভাষার প্রকৃতিসন্ধান সমস্যা

আমাদের এই পূর্বসূরীদের আন্তরিক গবেষণায় ও বিশ্লেষণে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ও অন্ধকার কালের অনেক তথ্য এখন আমাদের হস্তগত। কিন্তু তথাপি লক্ষ্য করা যাবে বাংলা ভাষার মূল সমস্যা যেখানে ছিল,আজও তা' সেখানেই আছে। এর কারণ কি ?

পুনর্গঠন তত্ত্বের যেসব সমস্যা প্রধান অনুসন্ধেয় তার আলোকে বাংলা ভাষার পরিস্থিতি, তার ব্যাকরণী সূত্রের অবস্থা, শব্দকোষের ধারণা ও প্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের পুনর্গঠন সমস্যার বাধা গুলি নিয়ে আমরা কিছু সামান্য উক্তি করবো।

ক. বাংলা সংকর ভাষা ঃ

ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষার ডালপালা বেয়ে অবশেষে ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আর্যদের যে সব ভাষা বিকাশ লাভ করে, বাংলা তারই অন্যতম, সুতরাং বাংলাভাষা যে 'ভারতীয় আর্যভাষার'ই বংশোদ্ভুত, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু এটুকুতেই এর সব পরিচয় ধরা পড়ে না। বস্তুত 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভাষা-অঞ্চলের' বহু বৈশিষ্ট্য বাংলা ভাষা ধারণ করে আছে। ভাষার একাধিক কালে ও একাধিক স্তরে আর্য-অনার্য দুই বিপরীত মুখী স্রোতধারার সংযোগে-সংমিশ্রণে, শাসনে-সমর্পণে বাংলাভাষা এক সংকর ধর্ম নিয়ে গড়ে উঠেছে। বাংলা ভাষার বাইরে রয়েছে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব ও ভাষা প্রক্রিয়া,- অন্তরে রয়েছে অন্তঃসলিলা দুই অনার্য ভাষা-সত্যের যৌথ ফল্গু। আর্য ভাষায় রয়েছে ব্যাকরণী কাঠামোর আরোপন, দক্ষিণ এশীয় ও দক্ষিণ পূর্ব এশীয় আর্য ভাষার রয়েছে রীতিগত উৎসার। এই ভাষার 'তাই'-ভাষাগোষ্ঠির অহোম ভাষার প্রভাব, তিব্বতী বর্মী গোষ্ঠির গারোভাষার প্রভাব, পূর্ব-দক্ষিণ বিহারের দ্রাবিড় গোষ্ঠির মালতো ভাষার প্রভাব এবং অস্ট্রো-এশিয়াটিক মহাভাষাবংশের মুণ্ডা গোষ্ঠীর সাঁওতালী, মুণ্ডারী, 'হো' প্রভৃতির মিলিত ভাষারূপের প্রভাব যথেষ্ট। এই প্রভাব বিষয়ে কোনও মতভেদ নেই , কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে কিছু মতানৈক্য দেখা যায়, সেটা বাংলা ভাষার বিকাশ ধারা নিয়ে। ভারতবর্ষের তথা পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের প্রায় সব ভাষার মত বাংলা ভাষাতেও সংস্কৃত ভাষার অধিপ্রভাব অসাধারণ এবং দ্রাবিড় ও মুণ্ডা এর দুই অন্তঃসলিলা ফল্গুপ্রবাহ । তাই বাংলা ভাষার ব্যাকরণী নিয়মে আছে আরোপনী ধারা, এটা আর্য প্রকরণ আর শব্দকোষ (দেশীয় শব্দ, ধ্বনাত্মক শব্দ ইত্যাদি) ধ্বনিতত্ত্ব (যেমন, ট-বর্গীয় ও ড় ধ্বনির ব্যবহারের অধিক হার, মহাপ্রাণতা ও ক্ষীণায়িত

মহাপ্রাণতা, দ্বিস্বরতা, শ-কারত্ব, আদ্য অবস্থানে সংযুক্ত ধ্বনির ভাঙ্গন ও য় ধ্বনির অব্যবহার) , রূপধ্বনিতত্ত্ব (স্বরসঙ্গতি; একাক্ষরিক মূলশব্দে স্বরের দীর্ঘতা ও বিভক্তি যোগান্তে হ্রস্বতা, প্রভৃতি) রূপতত্ত্ব (বিশেষ্য ও সংখ্যান্ত্য নির্দেশক, উভয় লিঙ্গ-বাচক শব্দের পূর্বে পুরুষ বা স্ত্রী-বাচক বিশেষণ, কারক-বিভক্তির বিশেষ ব্যবহার, ক্রিয়ান্তে সর্বনামের যোগ, প্রভৃতি) ও বাক্যতত্ত্ব (ক্রিয়াপদের বিশেষ্যী রূপের ব্যবহার ,শব্দ দ্বৈতের প্রয়োগ, মুণ্ডাভাষাধর্মী পদক্রম এবং দ্রাবিড় ভাষাধর্মী বাক্যরীতিগঠন, ব্যাকরণী লিঙ্গের সমীকরণ, না-বোধক ক্রিয়ার সংযোজন, ক্রিয়ান্ত্য অবস্থানে না-বোধক অব্যয় যোগ, উপবাক্যাংশ যোগে পরিপুরক বাক্য গঠন প্রভৃতি) মূলত. দক্ষিণ ও দক্ষিণ -পূর্ব এশীয় বৈশিষ্ট্যসূচক।

খ. বাংলা ব্যাকরণের মেষশাবকগাত্রে ব্যাঘ্র নির্মোক:

ভাষা হিসাবে বাংলা পৃথিবীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ভাষার অন্যতম। কিন্তু এভাষার কারক-সংখ্যা, বিভক্তি পরিচয়, ণত্ব-ষত্ব, ক্রিয়ার রূপ, সমাস সন্ধি, লিঙ্গ- বচন, প্রকৃতি-প্রত্যয় প্রভৃতি "আরোপন' পদ্ধতিতে গড়া। অর্থাৎ, অন্যভাষার আদর্শ অনুসরণে সৃষ্ট। এগুলি কৃত্রিম, -প্রাকৃত বা স্বাভবজ নয়। ব্যাকরণ প্রণেতাগণ বিশেষ উদ্দেশ্যে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, হীনমন্যতাবশত্ পরভাষার পরিভাষা বাংলাতে আরোপন করেন এবং যা নিতান্ত অসঙ্গত (যেমন নিজন্ত ধাতু, কারক প্রভৃতি) তা "বিপজ্জনক" ভাবে প্রয়োগেও দ্বিধা করেন নি। 'বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা'-এই ধারণাই ছিল এহেন সর্বনাশা কীর্তির মূল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাংলা ব্যাকরণ প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ।' তিনি মিথ্যা বলেন নি। কিন্তু তারও বেশী তিনি এর পরিণতির কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। যে জন্য এ উক্তি করতেও বাধ্য হয়েছিলেন যে "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় হয়"। অর্থাৎ সংস্কৃতে যা স্বাভাবিক , বাংলায় তা কৃত্রিম এবং কিঞ্চিৎ বাড়াবড়িও বটে। এতদসত্ত্বেও আমাদের মেনে নিতে হয় যে, সংস্কৃত ছাড়া এই উপমহাদেশের কোনও আধুনিক ভাষাই ভাবা যায় না- এমনকি দ্রাবিড়ি ভাষাগুলিও নয়।

বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা নয়, কিন্তু সংস্কৃত বাংলার "দূর সম্পর্কের আত্মীয়া"। ময়ূরপুচ্ছটা এর স্বাভাবিক বিকাশ নয়, অপ্রয়োজনীয় ভার। এ জন্যে বাংলাভাষা সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা সঠিক নয়। এটা বাংলার বেনামে সংস্কৃত ভাষার একটা তরল রূপের ধারণ। এই ধারণা নিয়ে বাংলাভাষার প্রকৃতি ও বিবর্তন (অর্থাৎ পুনর্গঠনতত্ত্বের আবশ্যিক শর্ত) কিছুই জানা বা বোঝা সম্ভব নয়।

যখন বলা হয়, 'বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয় নি,' তখন আসলে তাতে বোঝানো হয় যে সাধুভাষার অতিরিক্ত কোনও তথ্য সংগৃহীত ও ব্যাখ্যাত হয় নি। বাংলা

সংস্কৃত ভাষা নয় এবং সাধু ভাষাও বাংলার প্রকৃতিকে অর্থাৎ বাংলাভাষার মূল ধর্মকে ধারণ করে না। বাংলা ভাষার সাথে সম্পর্ক হল প্রাকৃতজনের। তাদের ভাষার ব্যবহারবিধি এবং অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে তার সূত্রগুলি কখনও গ্রথিত হয় নি।

বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয় নি। অর্থাৎ প্রাকৃত বাংলাভাষার ব্যাকরণ রচিত হয় নি। একথা অবশ্য উল্লেখ করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিধুশেখর শাস্ত্রী এরাও বার বার সেকথা আমাদের শুনিয়েছেন। আবার পাশপাশি পর্তুগীজ ও ইঙ্গভাষী মিশনারি এবং সিভিলিয়নদের হাতে, পণ্ডিত-মুনশি সহযোগিতায় আর একরকম বাংলার ব্যাকরণ তৈরী করা হয়েছিল। এগুলি যে দ্বিতীয়-ভাষা শেখার ব্যাকরণ রূপে সৃষ্টি হয়েছিল তাও নয়, তবে প্রথমত বৈদেশিদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যই প্রধানভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। বাঙালিরাও প্রথম এই উদ্দেশ্যে ব্যাকরণে আত্মনিয়োগ করেন, এমন কি ইরেজিতেও রচনা করেন। বাঙালিদের উপকারার্থে ও দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার কারণে ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ বাংলায় লেখার চিন্তা তাই আসে প্রথম। বাঙালির উপকারার্থে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বাংলায় লেখার প্রয়োজনই উদ্ভুত হয় নি। বাংলা ব্যাকরণ পাঠ্যবই হিসাবেই (নির্দিষ্ট ছকে) লিখিত হয়েছে। এর আবেদন স্কুল-কলেজ পর্যন্ত, এবং উদ্দেশ্য সংস্কৃত ভাষার নিয়ম বাংলাভাষায় কি পরিমাণ আছে সেটি মুখস্ত করানো। এর সৃজনশীল দিকগুলি সম্পর্কে অবহিত করা নয়।

বাংলা ভাষা আর্যভাষার সর্বশেষ পূর্বপ্রান্তীয় উপশাখা এবং প্রান্তীয় বৈশিষ্ট্যধারক ঐতিহ্যশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ ভাষা। গঠনের দিক থকে এটি মিশ্র (আর্য + অন্যান্য), ইতিহাসের দিক থেকে দ্বি-স্তরীয় (মুন্ডা-অন্তঃস্তর বা Sub-stratum), ব্যবহারের বা প্রসারের দিক থেকে আন্তর্জাতিক (প্রায় প্রতিটি মহাদেশের একাধিক কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার্য ভাষা, একাধিক দেশের ভাষাভাষীর মাতৃভাষা, একসময় ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ-ভাষা, এখন বাংলাদেশের আবশ্যিক রাষ্ট্রভাষা)। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একথা অবিসংবাদিত যে এতে সংস্কৃতের প্রভাব স্পষ্ট (বা সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তেলেগু প্রভৃতির মতই এর জন্ম, হিন্দী মারঠি গুজরাটি প্রভৃতির মতই বিবর্তিত), আবার একদিকে দ্রাবিড়, অন্যদিকে অস্ট্রিক-গোষ্ঠির ও ভোট -চীনীর সংস্পর্শতাজনিত স্বকীয়তার পরিচয়বাহী। এ ভাষার প্রত্নরূপ সন্ধান (পুনর্গঠন) সহজ নয়।[৬]

কিন্তু এ ভাষার ব্যাকরণ রচনার সমস্যামূলে রয়েছে অন্য আরও কিছু সমস্যা। বাংলাভাষায় ঊনিশ শতকী পণ্ডিত-মুনশি মিলে দুই ধরনের শব্দ, রেজিস্টার এবং তার ব্যাকরণ গড়েন অর্থাৎ নাম শব্দ (তৎসম, তদ্ভব, দেশী-বিদেশী) ছাড়াও ক্রিয়ার ব্যবহার (হইবে/হবে/হইতেছে/হচ্ছে), সর্বনাম ব্যবহার (তাহা/তা'), অব্যয় ব্যবহার

(যদ্যপি/যদিও), অনুসর্গ ব্যবহার(দিয়া/দিয়ে); রীতিব্যবহার (প্রাচীন/নব্য; গুরু/ লঘু; কৃত্রিম/ স্বাভাবিক). সাহিত্যরূপ প্রকরণ (প্রাবন্ধী/ নাট্যিক ও ভাব উপযোগী), মর্যাদা (আনুষ্ঠানিক , আভিজাত্যিক/ গণ), গঠন ও যুগগ্রাহ্যতা (অপরিবর্তনীয়/ পরিবর্তনশীল), প্রকৃতি(নির্দিষ্ট, অচঞ্চল/ গতিশীল ও জীবন্ত) ইত্যাদি রকমে ধরনে ও প্রকাশ বৈচিত্র্যে স্পষ্ট বিভাজনযোগ্য দুটি বাচন নির্মাণধারা ও তার কৌশল গড়ে তোলেন। একধারার উদ্দেশ্য সংস্কৃতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা; অপর ধারার উদ্দেশ্য ভাষাকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো। প্রথম শ্রেণীর হাতেই ব্যাকরণ রচনার কৌশল ও তার বিষয় নির্ধারণ এবং তার ভাষা-পরিভাষা স্থির করার দায়িত্ব আসে। বাংলা ব্যাকরণের শুরু এভাবেই।

গ 'প্রাকৃত বাংলা'—র প্রশ্নে আরও কথা:

বাংলা ভাষার গঠন, রৌপ (রূপগত) বিন্যাস, ধ্বনিপ্রকরণ ও শব্দকোষ কোন সত্য প্রমাণ করে তা নিয়ে ব্যাকরণ প্রণেতাদের মাথা ব্যথা তেমন দেখা যায় না। এ দেশে ভাষা আলোচনা মাত্রই ব্যাকরণ-সার। ফলে ব্যাকরণী আলোচনায় এ সত্যই প্রতিষ্ঠিত যে এ-ভাষার সংশ্লেষণ পদ্ধতি ও প্রত্যয়াদির অন্বয় প্রক্রিয়া ক্ষয়িষ্ণুতাধর্মী, এবং এর কারণ ভাষার পূর্বরূপ-উত্তররূপের সম্পর্কের ছিন্নতা নয়, অজ্ঞতা, অনীহা এবং ভাষার লোকায়ন অর্থাৎ স্থানিক রূপ ও প্রাদেশিকতার প্রভাব। তাঁদের ধারণা এ ভাষা সংস্কৃতের প্রভাবে সৃষ্ট। ('সংস্কৃতের দুহিতা'), অতএব সংস্কৃত ভাষার নিয়ম-বন্ধনই এতে মান্য, অন্যথা অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। কারণ ভাষার কৌলিণ্য রক্ষা না পেলে সে ভাষার মান-মর্যাদা এবং ঐতিহাসিকতার কিছুই থাকে না। অতএব ভাষা-ব্যবহারে ইতিহাসের চিহ্ন থাকতে হবে (যেমন ব্যাকরণের পরিভাষা অপরিবর্তনীয় এবং ব্যাকরণী শব্দে-বিশেষণ-রূপান্তরণে, ণ-ত্ব/ষ-ত্বে, লিঙ্গাদি নির্দেশক প্রত্যয়ে, বিভক্তিতে, সন্ধি ও সমাস গঠনে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মই প্রথামান্য),- তেমনি, মানমর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তথা শিষ্টায়ন প্রয়াসে তৎসম শব্দ ব্যবহার এবং বাক্যে অলঙ্কার বহুল অধীন বাক্যাদিসহ বহু যৌগিকতা বা অনুক্রমশীলতার রীতিগ্রহণ করতে হবে, তাতে, দূরান্বয়ঘটিত ত্রুটি ঘটলেও ক্ষতি নেই।

আসলে এটা এক ধরনের ভাষাশুদ্ধিকরণের চেষ্টা,– অষ্টাদশ শতকের বিবৃত রীতি উনিশ শতকে বিঘ্নিত হয়, খানিকটা গোরা ও বৈদেশিদের নির্দেশে, খানিকটা নতুন ব্যাকরণী কাঠামোতে প্রাকৃত-বাংলার বৈসাদৃশতায়। পণ্ডিতি ও শুদ্ধাচারী বাংলা এই ফাঁকটাতেই বিকল্প আদর্শ উপস্থিত করে এবং তার সাথে জাতীয়তার (ও 'হিন্দু রেনেসাঁর') নানা প্রশ্ন এবং সমাজভাষাতাত্ত্বিক সমস্যাও যুক্ত হয়।

যেটা ছিল সমাজভাষাতাত্ত্বিক সমস্যা, সেটা যে শুধু ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যযুগীয় সংস্কৃত ও ভাষা ব্যবহারের ধরনেরই পুনরাবৃত্তি ছিল তা নয়,আসলে ভাষার অবস্তরিক

রূপ [দ্রাবিড়ি ও কোল-মুন্ডা সংযোগগত উপাদান] সমূহ বৈদেশি উপাদানের জোরে শেকশুভোদয়া ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে ভিন্ন অঙ্গে রূপ নিচ্ছিল, এখন উনিশ শতকে সেই অর্জন নগরী ভাষার গাম্ভীর্য ও বিদ্যার্থীর মানসিকতা কারও কাছেই মূল্য লাভ করলো না। বিশেষ্যাদি শব্দে উপসর্গ ও কর্মপ্রবচনীয়াদি যোগ এবং ক্রিয়ার সাথে বিভক্তি চিহ্নাদি যোগ সংস্কৃতি নিয়ম হলেও সংস্কৃত ভাষার বাধাবন্ধন মধ্যযুগেই শিথিল হয়েছিল এবং তাতে সম্প্রসারিত ধর্ম যুক্ত হয়েছিল। শব্দের গঠন ও পদরূপান্তর নিয়ম এখানে এক নয়। এসব কারণে সংস্কৃত বাংলা সম্পর্ককে ত্যাগ না করেও প্রাকৃত বাংলার (স্বাধীন) বিকাশ ঘটাতে তখন কোনও বাধা হয় নি। কিন্তু নগরী বৈশিষ্ট্য রূপদানকালে কলকাতায়, বিশেষত পণ্ডিতি বাংলার পক্ষপাতীগণ বুঝতেই চাইলেন না যে এরা দুই ভাষা। তাই যেমন, রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, পদের গঠন এক হয়েও পদক্রম নির্বিশেষে বাংলায় কর্ত্তা ও কর্মে কোনও গোলাযোগ ঘটে না, কিন্তু সংস্কৃত নিয়মে সেটা অসাধ্য। যথা ঃ

মানুষ বাঘ মারে	বাঘ মানুষ মারে
মানুষ কুমীর খায়	কুমির মানুষ খায়

পদের এই গঠন ও অন্তর্গত প্রকৃতি বাংলাভাষার নিজস্ব । একে প্রাকৃত নিয়ম বলা যায়, সংস্কৃত নয়।

কিন্তু বাংলা ভাষার এই রূপটির যথার্থ ব্যাখ্যা ব্যাকরণে নেই।

রবীন্দ্র-উক্তি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় সমস্যাটি কি [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ ১৩৯১]:

১. 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়; বোপদেবের চেলারা যেখানে ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া আছেন সেখানে বাংলা ভাষায় বাংলা-সাহিত্যের ব্যবসা চালানো দুঃসাধ্য হইল।' (৬) ... ' সংস্কৃত বৈয়াকরণের বর্গির দল আমাদের লেখকদের ত্রস্ত করিয়া [রাখিয়াছেন]।' (৭)

২. "সংকৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।"(২০)

৩. 'সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা বাংলা ব্যাকরণে প্রয়োগ করা...বিপজ্জনক-' (৮৯)

৪. 'বাংলা ব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বাংলার কারক-বিভক্তিকে সংস্কৃত কারক বিভক্তির সঙ্গে অন্ততঃ সংখ্যাকেও সামান বলিতে চান। (১০৬)

রবীন্দ্র উদাহরণ

বাংলা	সংস্কৃত
বাঘে খাইল	ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ
বাঘে রামকে খাইল	ব্যাঘ্রেণ রামঃ খাদিতঃ

রবীন্দ্র ব্যাখ্যা :

> 'কর্মবচ্যের ক্রিয়া বাংলায় কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার হইতে থাকায় সংস্কৃত ব্যাকরণ আর তাহাকে বাগ মানাইতে পারে না। সংস্কৃত তৃতীয়া বিভক্তি'এন' বাংলায় 'এ' হইয়াছে, যেমন, বাঁশে মাথা ফাটিয়াছে, চোখে দেখিতে পাই না ইত্যাদি। বাঘে খাইল, কথাটার ঠিক সংস্কৃত তর্জমা ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ। কিন্তু খাদিত শব্দ বাংলায় খাইল আকার ধারণ করিয়া কর্তৃবাচ্যের কাজ করিতে লাগিল; সুতরাং বাঘে যাহাকে খাইল, সে বেচারা আর কর্তৃকারকের রূপ ধরিতে পারে না। এইজন্য ব্যাঘ্রেণ রামঃখাদিতঃ, বাংলায় হইল বাঘে রামকে খাইল ; বাঘে শব্দে করণ কারকের এ-কার বিভক্তি থাকা সত্ত্বেও রাম শব্দে কর্মকারকের কে বিভক্তি লাগিল। এ খিচুড়ি সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনো পর্যায়েই পড়ে না।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলা শব্দতত্ত্ব, ১০৭ পৃষ্ঠা)

এই আলোচনা থেকেই বোঝা সম্ভব যে আর্যভাষার ধ্রুবরূপ ও প্রাকৃত রূপের চরিত্র এক নয়, গঠনবৈশিষ্ট্য ভিন্ন অর্থাৎ দুই ব্যাকরণী নিয়ম ও ব্যবহারিক বাস্তবতায় গড়ে উঠেছে এই দুই রূপ। ড. শহীদুল্লাহ্ এর বিস্তারিত ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(৬.২) বাংলা ভাষার পুনর্গঠন-পরিস্থিতি, পুনর্বিচার

বাংলা ভাষার প্রাকৃত ধ্বনি ও রূপের বিবর্তন প্রশ্নে ঐকমত্য গড়ে ওঠে নি কোনও কালেই। এর কারণ সামাজিক দ্বন্দ্ব যত না তারও বেশী অন্ধসংস্কার। ভাষা মর্যাদার প্রশ্নে এ যাবৎ যে সব ধারণার প্রাধান্য ছিল সেগুলির প্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। অর্থাৎ উপরোক্ত ধারণা দ্বারা এই পুরনো ধারণাগুলি এখানে পুনবিচার্য।

১. বাংলা ভারতীয় আর্যভাষার শাখা এবং আর্যভারতের সাধারণ পরিচয় 'যোজনান্ত ভাষা' -এক যোজন পর গেলেই ভাষার পরিবর্তনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যদিও পরিবর্তনের শুরু লক্ষিত হয় না কোথাও। অর্থাৎ সর্বত্রই ধারণা হয় যে এই পরিবর্তন আরও আগে বা আরও পরের কোনও এলাকাবাসীদের ভাষায় হয়েছে, অর্থাৎ সঠিকভাবে 'সীমান্ত' চিহ্নিত করা যায় না। এর ফলে প্রথমাবধিই ধারণা ছিল যে এ দেশে ব্রাহ্মণেরাই এদেশের মানুষকে ভাষা শিখিয়েছে।

২. মূল বা মান্যভাষার ভিত্তি হিসাবে নির্দিষ্ট উপভাষা চিহ্নিত করা যায় না। বাংলাভাষার শিষ্ট কথ্য ভাষা রূপটির বা তার আগেও সাধুভাষার রূপটির মূল ভিত্তি হিসাবে কখনও বলা যায় নি যে এই স্থানীয় ভাষা বা এই বিশেষ রূপটি

ঐতিহাসিক ভাব মান্য হয়েছে। (রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেন, 'স্বাভাবিক কারণেই কলিকাতা অঞ্চলে একটা ভাষা জমিয়া উঠিয়াছে তাহা বাংলার সকল দেশের ভাষা। ... ঢাকাতেই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চয়ই ঢাকার লোকভাষার উপর আমাদের সাধারণ ভাষার পত্তন হইত।')

৩. বাংলাভাষার কেন্দ্রীয় রূপ বা কেন্দ্র এক না আনহি বলা যায় নি। এই ভাষার কেন্দ্র নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর-হুগলি-কলকাতা এবং ঢাকাও বটে। এর রূপগুলি যশুরী-ভাগলপুরী দামোদরী-শন্তিপুরী এবং ঢাকা কলকাতা এক ধরেও তার নানারূপ। স্যামবাজারী(শ্যামবাজারের) ভাষাকে আদর্শ কলকাতার ভাষা যেমন বলা যাবে না তেমনি কলিগঞ্জের শ-প্রধান ভাষারূপকেও আদর্শ মহানগরী ভাষা বলে কেউ গ্রহণ করবেন না।[৭] সহজভাবে তাই বলা হয়, সাহিত্যের ভাষা'-ই ['পাকা ভাষা'] কলকাতার ভাষা। কিন্তু সাহিত্য একটা বিমূর্ত বিষয়, এই ভাষার ব্যবহারিক রূপ অভিধান ধরে আলোচনা করলেও শেষ কথা (মূলাদর্শরূপ) খুঁজে পাওয়া যাবে না- ' বৈচিত্রিক পার্থক্য' বলে শেষ রফা করতে হয় তখন।

এই সমস্যার রূপ মধ্যযুগে কি ছিল বলা মুশকিল। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজাকে তুষ্ট করেছেন। কিন্তু আলাওল কোথায় পেলেন ভাষা ? মকুন্দরাম ছুটাছুটি করলেও নিশ্চয়ই মাতৃভাষা থেকে দূরে যেতে পারেন নি। কিন্তু তবু পয়ারবন্ধে সে ইতিহাস ভিন্নই ভাববো। কিন্তু আধুনিক কালে প্রবেশ লগ্নে গদ্যের প্রকাশভঙ্গী ছিল আড়ষ্ট। এ অবস্থা কাটিয়ে পরে elastic ধর্ম গ্রহণ করে। একে বলা হয় 'নিজস্ব প্রকৃতির গদ্যভঙ্গী'। হারাণচন্দ্র রক্ষিত '*ভিক্টোরিয়া রাজত্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে*'(১৩০৮), বলেছেন 'মিশনারী বাংলা'র পাশেই' 'অবস্থান করেছেন' 'পণ্ডিত বাংলা'। চিঠিপত্রে, প্রশাসনে , দলিলে, পাঠ্যগ্রন্থে ও ব্যাকরণে এবং ইতিহাস কথা ও সংবাদ-সাহিত্যে নব্য অভিপ্রায়ী গদ্য সৃষ্টি হয়েছে। ঐ '*ফিশারম্যানস ল্যাঙ্গোয়েজ*' -এর ভিত্তিতেই। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা এখানে সরদারের ভূমিকা; দিকপালের ভূমিকা। অবস্থাভেদে তখন সংস্কৃত-আঞ্চলিক ভাষা শূন্যস্থান পূরণের দায়িত্ব নিচ্ছে। দলিল দস্তাবেজে আরবী ফার্সি, অহোম রাজার চিঠি ইত্যাদিতে উত্তরবঙ্গের ভাষা, বৈষ্ণব কড়চা ও ধর্মীয় পুস্তকে সংস্কৃত-এ সব তো কেবল কোড-মিশ্রণই নয়, মান্য ভাষার অভাবজনিত ফাঁকও বটে। রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছেন 'ভাষার কাঁচা অবস্থা'। পর্তুগীজ বাংলায় এলো প্রথম 'প্রকাশ্য ব্যবহার', ইংরেজ ও মিশনারী গদ্যে পণ্ডিত-মুনশীর অভ্যাস-অনুক্রম ছাড়িয়ে প্রথমে ঘটে অনুবাদ দলের নব্য অভ্যাস এবং তারও পরে পাদ্রীদের ও *সিবিলিয়নদের* সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন রামরাম বসু

থেকে রামমোহন। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় পর্যন্ত অনুবাদকারের দলে হারিয়ে যেতে দেখি। বাংলা ভাষাকে আনুকুল্য দানে এঁদের ছিল স্পস্ট অনীহা, যদিও বাংলাভাষা এখানে মধ্যযুগীয় ভাষার অতিরেক কিছুই ভাবেন নি তাঁরা। ভাষার স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে এভাবে প্রথমাবধি ধারণার স্পষ্টতা না থাকায় গোলক ধাঁধায় এ ভাষার ব্যবহার ডামাডোলে এগিয়ে আসতে থাকে আলালী-হুতোমী-সাগরী-বঙ্কিমী পৈঠায়। বঙ্কিম চন্দ্র ভাষার ধর্ম বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু চলিত ভাষার মর্ম কি বুঝেছিলেন ? কেন্দ্র আবার সরে গেল। এদের সকলেরই ভাষা ছিল বানানো।

(৬.৩) বাংলা শব্দ-কোষের ভ্রান্তি

শব্দকোষ ও বাংলা অভিধানে শব্দ 'চারি প্রকার,' এই ধারণা সনাতন। কিন্তু শব্দের বিস্তার ও তার অর্থের সাথে শব্দের গঠনের সম্পর্ক নিয়ে মানুষের ধারণাকে কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে। 'প্রাকৃত বাংলা'র দৃষ্টিতে এর অন্য ব্যবহারিক রূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা খুব একটা হয় নি। যাইহোক, অনিমেষ পাল, হায়াৎ মামুদ, মনসুর মুসা, নরেন বিশ্বাস প্রভৃতির কিছু প্রগত আলোচনা সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে এই 'চারিপ্রকার' এর connotative value ও পরিচিতির কোথাওবা বৃদ্ধি বা সম্প্রসার, আবার কোথাও সংকোচনও ঘটে থাকতে পারে এবং এর একটা রূপ তাই নিম্নপ্রকার হতে পারে বলে এদের আলোচনা থেকে ধারণা করা যায়, যথা•

বাংলাভাষার শব্দ
↓
↓
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
'তৎসম' 'তদ্ভব' 'দেশীয়' গ্রাম্য অপ/ বিকৃত সৃজিত শিক্ষিত

অবশ্য প্রাকৃত পৈঙ্গল-বিশেষজ্ঞগণের প্রভাব এর মধ্যেও রয়েছে, এবং এছাড়াও একটা সরল বিন্যাস রয়েছে যা অনেকে হয়তো মানতে আগ্রহী হবেন না। রবীন্দ্রনাথ তো দেশীয় ও অন্যান্য শব্দগুলিকে 'প্রাকৃত' ('প্রাকৃত বাংলা') বলার পক্ষপাতী। বাংলা শব্দের যথার্থ পরিচয় জানতে গেলে তার শ্রেণীকরণ বৈজ্ঞানিক হতে হবে ও প্রত্ন পর্যায়ে ও বাস্তব ব্যাখ্যাযোগ্য অবস্থান থাকতে হবে। এক্ষেত্রে অনেকে এরূপ দ্বিস্তরিক বিভাজনের পক্ষপাতী হবেন। যথা-

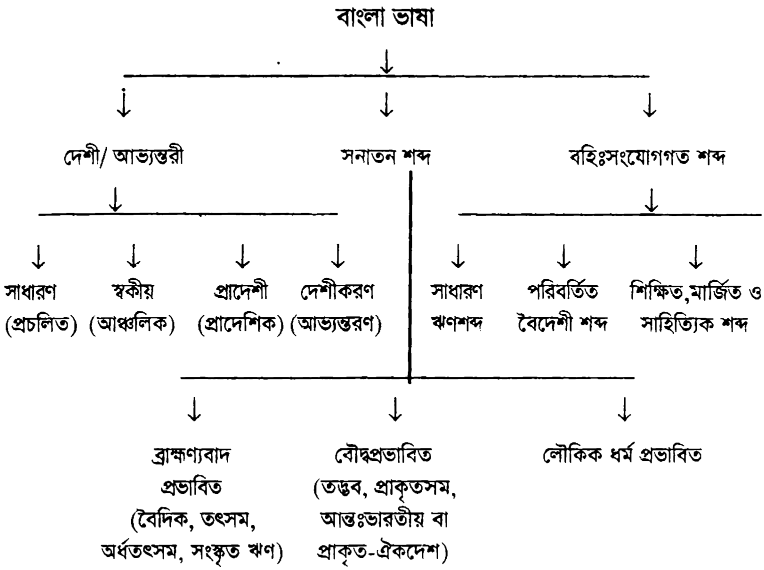

শব্দ বিচারের মধ্যে অর্থগত তাৎপর্য ও ব্যাকরণী তাৎপর্যের মিলন সম্ভব, ভাষার সৃষ্টি (উদ্ভব) ও বিকাশধারা পুনর্গঠনের এটাই সূত্র। প্রতিটি বিভাগের শব্দই আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে ভাষীর অবস্থান, মর্যাদা ও ব্যবহারক্ষেত্র অনুযায়ী বি[illegible] কিংবা অপকৃষ্ট । ধ্বনি ব্যবহার ও ব্যাকরণীসূত্র প্রয়োগের[৮] ধরন বৃদ্ধির সাথে এই ছক বর্ণিত পরিস্থিতির সম্প্রসারণ ওতঃপ্রোত জড়িত।

৭. প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের প্রশ্ন ও শেষ কথা

ভাষার প্রকৃতি না বুঝার জন্য অথবা বুঝেও সেই প্রকৃতিতে সমর্পিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইতস্ততা থাকায় ভাষার রূপ (ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, শব্দতাত্ত্বিক প্রভৃতি) বিষয়ে কোনও নতুন আলোকপাতের চেষ্টা হয় নি কখনও। এটা ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও বুঝতে পারি যখন দেখি বাংলা গদ্য ভাষার গঠন এক হয় নি, হতে পারে নি, যতদিন না রবীন্দ্রনাথ উপদেশ কথা বাদ দিয়ে বাস্তব উদাহরণ হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন। ১৩২৩ সালেও রবীন্দ্রনাথকে বলতে দেখা যাচ্ছে, 'যতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাঁট না গ্রহণ করিবে ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য সীমানা পাকা হইতে পারিবে না।' শুধু তাই নয় একই লেখায় তিনি 'সবুজপত্র' সম্পাদকের পৌরোহিত্যের উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, 'শুভস্য শীঘ্রং'। সাধুভাষা ও সংস্কৃত

প্রবাদী বাক্যেই কবি বলেছিলেন, এই গুরুতর কথা। যাই হোক কেবল কোড পরিবর্তন (code switchening) ই নয়, পূর্ব ভাষারূপের সকল বৈশিষ্ট্য এবং তার অতিরেকও কিছু এই নতুন কোডায়ন প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট করাবার প্রয়োজনের প্রতিও ইঙ্গত করেছেন :

> 'একথা স্বীকার করিতেই হইবে সাহিত্যে আমরা যে-ভাষা ব্যবহার করি ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা দাঁড়ইয়া যায়। তার প্রধান কারণ সহিত্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে এবং তাহা সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরস করিয়া প্রকাশ করিতে হয়।'

এই উক্তিতে সমাজ ভাষাতত্ত্বের সূত্রগুলিই নির্দেশিত হয়েছে। ফিশম্যান প্রভৃতি কথিত ভাষা উন্নয়নের বিবিধসূত্র বা প্রক্রিয়া (আধুনিকীকরণ, প্রমিতকরণ ও সর্বজনীনীকরণ) প্রচারের অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় তা' ব্যক্ত করেছিলেন এটা ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগে। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথ একাই তা সমাধা বা সম্পূর্ণ করে গিয়েছিলেন। তাতেই বাংলাভাষা রাতারাতি জগৎসভা উজ্জ্বল করে তুলতে সক্ষম হলো।

কিন্তু রহস্যটা কি ? এটা আর কিছুই নয়, ভাষা পরিবর্তন। বাঙালী (বাংলাভাষী) মনে করলো সনাতন (সাধু) ভাষা (code) থেকে'প্রাকৃত ভাষাই (সাধারণ, people's language) তার অধিক আপন : একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে [তত্ত্বীয়ভাবে এর ব্যাখ্যা এই রূপ হতে পারে, যেমন সনাতন রূপ, ⇒'মিশ্র' রূপ ⇒ কৃত্রিম রূপ ⇒ সৃষ্টিশীল রূপ (আধুনিক /নব্য/ উত্তর আধুনিক) প্রভৃতি]। এইভাবে, রবীন্দ্র ভাষায় 'লোকভাষার উপর আমাদের সাধারণ ভাষার পত্তন, হলো এবং 'সকলের সম্মিলনে যে এক-ভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার সমস্ত প্রদেশে ছড়াইল পড়িতেছে' ও 'একটি বিশেষ ভাষা' রূপে 'বাংলাদেশের সমস্ত ভদ্রঘরের ভাষা হইয়া উঠিতেছে।' যোগেশ রায় বিদ্যানিধি, রাজশেখর বসু একে 'সর্বসম্মত সর্বাঞ্চলবাসী বাঙালীর বোধ্য' ভাষারূপ বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

ভাষার এই রূপ পূর্বে ছিল না এবং ছিল অকল্পনীয়। ভাষার এই পরিবর্তন যেখানে অবধারিত, অবশ্যম্ভাবী ও বাধ্যতাধর্মী, সেখানে স্থানীয় ভাষার ইচ্ছাটাই মূল, নিয়মটা নয়। এই পরিবর্তনে প্রামথী সূত্র একবার সহায় হলেও তাকে সাঁকোর মূল্যেই ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষা এগিয়ে গেছে সেই সাঁকো পাওয়ামাত্রই। রবীন্দ্রনাথই তার প্রমাণ। অভ্যাসবশত সাধু গদ্যের পিছুটান মাঝে মধ্যে থাকলেও অতঃপর তাঁর প্রধান বাহন যে চলিত রীতি তথা কথ্য ভাষা-ই ছিল এতে সন্দেহ

নেই। বাংলাগদ্য ও বাংলাভাষার পরবর্তী ইতিহাস এখানে বিস্তৃত বলার বা সমকালের ভাষারূপের ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রয়োজন নেই। সাধারণ সূত্রটাকে বোঝাবার জন্যই এই প্রয়াস। ভাষার যে প্রকৃতি (অন্তপ্রকৃতি) তার মধ্যেই থাকে সেই রূপকথার 'ভোমরা 'প্রাণ। গভীর জলের নীচে রূপোর কৌটোর ভিতর এবং ওপরে দেও-দৈত্যের পাহাড়ায় তার দুঃখের কাল কাটে। উদ্ধার করলে রাজকন্যা এবং হয়তোবা অর্ধেক রাজ্যও ফাও মেলে।

টীকা

১। সীমিত পদ্ধতি ও তথ্যের আলোতে অন্যত্র আমার দেওয়া 'মডেল' লক্ষ্য করুন (দ্রষ্টব্য, মনিরুজ্জামান ১৯৭৭, ১৯৮৫ ইত্যাদি)।

২। সনাতন আলোচনার প্রসঙ্গগুলি এখানে বাদ রাখা হলো।

৩। দ্রষ্টব্য, তাঁর গ্রন্থ 'ভাষা'(১৯২৯)-র চতুর্থ অধ্যায়।

৪। দ্রষ্টব্য, ১নং পাদটীকায় উল্লিখিত তথ্য। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পুনর্গঠন তত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণা ও গৌড়ী-প্রাকৃত পুনর্গঠন চিন্তা নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি (দেখুন মনিরুজ্জামান ১৯৯৪ ক) ; এখানে তার পুনরুল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম।

৫। তুং. 'ইউরোপে শব্দবিদ্যার যে ইয়তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন, তাহার মূল। .... ডাক্তার মক্ষমূলর সংস্কৃত ভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।' — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

৬। ইতোমধ্যেই গ্রীয়ার্সন সুনীতিকুমার বনাম শহীদুল্লাহ্‌ বিতর্কের কথা প্রচারিত হয়ে আছে।

৭। [রবীন্দ্রনাথও সচেতন করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, কলকাতারও স্থানীয় ভাষা ('স্বকীয় অপভাষা') আছে, যেমন ' ভেয়ের বে' অর্থাৎ ভাইয়ের বিয়ে]।

৮। দেখুন, মনসুর মুসার 'বাঙলা ব্যাকরণে নবসৃষ্ট বাংলা শব্দের স্থান', ভাষা (কলিকাতা) ৬ষ্ঠ ১ম সংখ্যা: ১৬-২২ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থপঞ্জি

বাল গোবিন্দ *মিশ্র, দ্রষ্টব্য Misra, B. G.*

মনিরুজ্জামান, দ্রষ্টব্য, Maniruzzaman.

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

১৯৬৫ : *বাঙ্গলা ভাষার ইতিবৃত্ত।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৯১ : *বাংলা শব্দতত্ত্ব*। (প্রথম প্রকাশ ১৩১৫/ ১৯০৯)। বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯২ : *সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষা*। কলিকাতা।

সুকুমার সেন

১৯৭৯ : *ভাষার ইতিবৃত্ত*। ত্রয়োদশ সংস্করণ। কলিকাতা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *দ্রষ্টব্য Chatterji, S.K.*

Anderson, J, M

1986 : *Structural Aspects of Language Change.*
(First published 1973). Longman,Singapore.

Banerjee, S. C.

- : *Sanskrit Beyond India.* Calcutta, Saraswati Library,
xii+244pp.

Banerjee, S. R. (ed.)

1990 : *Essays on Indo-European Llinguistics.* The Asiatic Society,
Calcutta,

Crystal, David

1987 : *The Cambridge Encyclopedia of Language.* C.U.P
Cambridge.

Chatterjce S. K.

1986 : *The Origin and Development of the Bengali Language.* 3
parts; Rupa & Co, Calcultta. Ist ed. Calcutta University
1926).

Lane G. S.

1949 : On the Present State of Indo European Linguistics.
Language , Vol. 25.

Lehman, Winfed P.

1973 : *Proto-Indo-European Phonology.* (Ist ed. 1952)
seventh print,

Lehman, W. P & Y. Malkiel (Ed.)

1968 : *Directions for Historical Linguistics, A Symposium.*

Lockwood, W.B.

1971 : *Indo-European philology.*(Ist ed. 1969)

Maniruzzaman

1977 : *Controlled Historical Reconstruction based on Five Bangali Dialects.* Ph.D. Thesis Mysore University & C.I.I.L, Mysore (unpublished).

1985 : *ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

1991 : *Studies in the Bangla Language.* Adiabad Sahitya Blavan & Bhasha Tattva Kendra.

১৯৯৪ : *উপভাষা চর্চার ভূমিকা*। বাংলাএকাডেমি, ঢাকা।

১৯৯৪ক : 'ভাষা- বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্;'। *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০১: ১-১৭ পৃষ্ঠা।

Mandal, P. C.

1979 : 'A Phonological feature of Proto-Bengali'. BDCPL (Bulletin of the Department of Comparative Philology and Linguistics, Calcutta University) No. 3, 1978 : 79–87.pp.

Maurice Leroy &G. Price (tr.)

1967: *The Main Trends in modern Lingustics.* Oxford.

Misra, B. G.

1967 : Historical Phonology of Modern Standard Hindi : Proto Indo- European to the present. Ph.D. Thesis, Cornell University (unpublished).

Pattanayak, D. P.

1976 : A Cotrolled Historical Reconstruction of Oriya, Assamese, Bengali and Hindi. Mouton Edition. PP. 90. (Ph.D. Thesis, Cornell University, 1961).

Renfrew, Colin

1987: *Archeology & Language. the puzzle of Indo European Origins.* London.

Sen, Subhadra Kumar

1973 : Proto–New Indo–Aryan. Calcutta. x+180 pp.

Szemeretyi, Oswald J. L.

1985 : Recent Developments i Indo-European Linguistics. TPS (Transactions of the Philological Society), 1-71 pp.